

ওয়ান ইলেভেন

সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার

ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

ওয়ান ইলেভেন

সংস্কারের রাজনীতি নয়
রাজনীতির সংস্কার

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.amarboi.org

ওয়ান ইলেভেন

সংস্কারের রাজনীতি নয়
রাজনীতির সংস্কার

মুহাম্মদ রেজাউল করিম

প্রকাশনায় : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৭১১-১২৮৫৮৬
০১৫৫২-৩৫৪৫১৯

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ: শাওয়াল ১৪৩০ হিজরী
অক্টোবর ২০০৯ ইংরেজী

কম্পোজ ও ডিজাইন : প্রফেসর'স কম্পিউটার, মগবাজার-ঢাকা

মুদ্রণ : ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস-ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

বিনিময় মুল্য: ১২০.০০ টাকা মাত্র

PPBN-71
ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : ১২০ টাকা মাত্র (অফসেট কাগজ) ।
ইউএস ডলার : ৩ ডলার মাত্র ।

One Eleven Shongskarer Rajniti Noy Rajnitir Shongskar, Writen by Muhammed Rezaul Karim, and Published by Professor's Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price offset Paper : Tk.120.00 only.US$ 3.00 Only.

www.amarboi.org

উৎসর্গ–

পরম শ্রদ্ধেয়
আব্বা
মরহুম মাওলানা হোসাইন আহমদ
ও
আম্মা
করিমুন নেছা
যাদের ঋণ কখনো শোধ হবার নয়...

www.amarboi.org

লেখকের কথা

পত্র-পত্রিকায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমার সাম্প্রতিক লেখালিখি একটি মলাটের মধ্যে একসঙ্গে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অনেকে। আলহামদুলিল্লাহ। ইতোমধ্যে "জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়" নামে আমার প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বই আকারে পাঠকের সামনে উপস্থাপনের এটা আমার দ্বিতীয় প্রয়াস। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, সমসাময়িক বিষয়-আশয় নিয়ে দৈনিক পত্রপত্রিকায় যে কলাম লেখা হয় সেগুলোকে প্রতিদিনের ঘটনা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম থেকে আলাদা করে পাঠ করলে বোঝা খুব কঠিন। লেখাগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়বদ্ধতার একটি উচ্চারণ মাত্র।

বইটার নাম দেয়া হয়েছে "ওয়ান ইলেভেন : সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার"। এতে আমি বলতে চেয়েছি আমরা এক ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছি। এই বিপর্যয়ের মধ্যে পতনের জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো ঘটনাবলি বিশ্লেষণ ও বোঝা।

দেশের ভবিষ্যৎ নিমজ্জিত হয়েছে কোন্ এক অন্ধকার গলিতে। বন্দী হয়ে আছে বিদেশী শক্তির পুতুল হিসেবে প্রাণপ্রিয় জন্মভূমিকে যারা পরিণত করতে চায় এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে রাজনীতি শূন্য করতে চায় তাদের হাতে। ইতিহাসের এক রক্তভেজা কালো অধ্যায়ের জন্ম দিল ২৮ অক্টোবর, রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে কায়েম করল লগি-বৈঠার এক ভয়াল তাণ্ডব। বিশ্বের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। সেদিন অপার বিস্ময় নিয়ে সারাবিশ্ব এই পাশবিক বর্বরতাকে অবলোকন করে শিউরে উঠেছে। অনেকে বলে থাকেন ২৮ অক্টোবরের জের ধরেই ১/১১-এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি ১/১১-এর ঘটনা ঘটানোর জন্য একটি উপলক্ষ হিসেবে ২৮ অক্টোবরের নির্মম নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। 'মাইনাস টু' ফর্মুলা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টারত মহলটি অবশেষে ১/১১ নিয়ে এলো। বাংলাদেশ প্রবেশ করল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এর গন্তব্যের শেষ আসলে কোথায়? ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দিতে পারব কি আমরা? এই প্রশ্ন এখন আমাদের সকলের।

লেখাগুলোর সম্পাদনার কাজে জুবায়ের হুসাইন প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তাকে ধন্যবাদ। মহিউদ্দিন মধু প্রকাশকের সাথে সমন্বয় সাধন করেছেন। তাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর'স বুক কর্নারকে এবং যেসকল পাঠক ধৈর্য ধরে আমার বইটি পড়বেন তাদেরকে। পাঠকদের হৃদ্যতাপূর্ণ ভালোবাসা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য চেয়ে শেষ করছি।

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
১১ অক্টোবর, ২০০৯

www.amarboi.org

অভিমত

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে লেখা, **"ওয়ান ইলেভেন: সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার।"** এটি লেখকের একটি সাহসী পদক্ষেপ। এ জাতীয় লেখায় হাত দেয়া সত্যিই সাহসের ব্যাপার। লেখককে সে কারণে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় ও রাজনৈতিক জীবনের নানান অসঙ্গতি এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তার থেকে পরিত্রাণের উপায়ও বলে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রয়োজনীয় দিক অর্থাৎ রাজনীতির সংস্কারের বিষয়টি তিনি জোরালোভাবেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্নের সাগরে সাঁতার কাটতেও পিছপা হননি তিনি। এ থেকে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তিনি দেশকে ও দেশের মানুষকে কতটা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। সকল অন্যায় ও ষড়যন্ত্র প্রতিরোধে সকলকেই একসাথে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন, আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বদেশকে ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করি এবং দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নজরানা পেশ করে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখি। তাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অন্তত আমরা তাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই পরিগণিত হবো।

আমি বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।

মাহমুদুর রহমান
সাবেক উপদেষ্টা,
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

www.amarboi.org

সূচিপত্র

- ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক/৭
- বাম রাজনীতির খপ্পরে ধরাশায়ী আওয়ামী লীগ/২৩
- ২৮ অক্টোবর : ইতিহাসের কালো অধ্যায়/২৯
- আবদুল জলিলের বোমায় বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগ/৩৬
- অকুতোভয় মাহমুদুর রহমান/৪০
- বিতর্কিত সিইসি'র বোধোদয় আদৌ হবে কি?/৪৩
- মহাজোট সরকারের ১০০ দিন/৪৬
- ছাত্ররাজনীতির এ কোন্ হিংস্রতা/৫২
- প্রসঙ্গ ছাত্ররাজনীতি : সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই/৫৭
- নির্যাতিত ছাত্রসমাজ, অপমানিত সেনাবাহিনী/৬২
- নব্য স্বৈরাচার জেনারেল মইন কি বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাবেন?/৬৭
- গণতন্ত্র ও সাম্প্রতিক ভাবনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ/৭০
- জাতীয় নেতৃবৃন্দ কি বিদ্বেষের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন?/৭৯
- গোয়েবলসীয় সূত্রে জঙ্গিবাদ/৮৪
- জোট সরকারের বর্ষপূর্তি: জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি/৯৩
- মাদ্রাসা ছাত্রদের সম্ভাবনাকে হত্যা করা হবে আর কতদিন/১০১
- সংবাদপত্র ও বামপন্থীদের আন্দোলন/১০৪
- রাবিতে ড. তাহের হত্যা: সংবাদের পোস্টমর্টেম/১০৭
- পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের বিজয়, সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন দোসরদের উদ্বেগ/১১৬
- সেনা অভিযান : গরম ভাতে বিড়াল বেজার/১১৯
- আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি ও ইসলামবিদ্বেষী ভূমিকা/১২৪
- মালয়েশিয়া : সফল নেতৃত্বের অন্যতম মডেল/১৩২
- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নকল : জোট সরকারের পদক্ষেপ/১৪১
- তিন প্রধানের বেড়াজালে আওয়ামী বিধিবাম/১৪৬
- ওয়ান ইলেভেন : সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার/১৫২

www.amarboi.org

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক

পারমাণবিক বোমা আকিষ্কারের পর অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নামে ধর্মীয় নীতি নৈতিকতার সামান্য অবশিষ্ট অংশটুকু বাদ দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" এ কথাটি যত সহজে উচ্চারিত। এর উপলব্ধির জায়গা তার থেকে অনেক অনেক গভীরে প্রথিত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৮ বছরে আমরা সর্বমোট ১০টি শিক্ষা কমিশন/শিক্ষা সংস্কার কমিটি/অন্তর্বর্তীকালীন টাস্কফোর্স/শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির বিশাল বিশাল রিপোর্ট পেয়েছি। এ সকল কমিশন/কমিটির রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, সামগ্রিকভাবে এসব কমিশন/কমিটি তাদের প্রতিবেদনে ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশি জাতির শিক্ষার ভিত্তি নির্ধারণ তথা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নে দারুণভাবে ব্যর্থ। কখনও নিজস্ব চিন্তাকে জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা হয়েছে আবার কখনও নিজস্ব আদর্শের বোঝা জাতির কাঁধে তোলার চেষ্টা হয়েছে বারবার। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা এখনও যেন ব্রিটিশ বেনিয়া দালাল চক্রের খপ্পর থেকে স্বাধীন হতে পারিনি।

বর্তমান শিক্ষা কমিশনের কর্তাগণ চিন্তাভাবনায় মাস্কোপন্থী, রক্তে মাংসে ভারতীয় আর অবয়বে শুধু বাংলাদেশী। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে বামপন্থী কমিউনিস্টদের পোয়াবারো। আওয়ামী সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ১২ জন বামপন্থী প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে এখন তাদের অবস্থান। ৯৫% মুসলমানের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব তিন নাস্তিকের ওপর ন্যস্ত। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, ও জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী তিন বামপন্থী কমিউনিস্ট। সুতরাং তাদের গঠিত শিক্ষানীতি ধর্মের বন্ধনমুক্ত। কারণ তারা কোন ধর্মই বিশ্বাস করে না। ইসলাম,

www.amarboi.org

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কোন ধর্মের প্রতিই তাদের কোন বিশ্বাস নেই, এ কারণে তাদের প্রণীত শিক্ষানীতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই, তারা আল্লাহ, রাসূলের (সা) ও ধর্মকে ভালবেসে নয় বরং মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করে নামাজ আদায় করেন শুধুমাত্র এ দেশের মানুষের ধর্মীয় ভালবাসাকে পুঁজি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য চেষ্টা করে মাত্র। এই বিতর্কিত তিন ব্যক্তি দিয়ে গঠিত শিক্ষানীতিতে বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি, তাহজিব, তামাদ্দুন এর প্রতিফলন না হওয়ার আশঙ্কা দেশের মানুষ শুরু থেকেই করে আসছে।

কমিশন শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস, গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের ওপর তাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করেছে। তাই আংশিক দিক থেকে আমরা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের মনন ও মানসজগৎকে ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকল ও নব্য সাম্রাজ্যবাদী/ নব্য উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারিনি। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, *"মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। ... এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেক্যুলার গণমুখী, সুলভ, সার্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।"*

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

'Education' প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটেছে ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে, ইংরেজিতে এর ভাবার্থ হচ্ছে 'to lead out' বা 'to draw out'। শিক্ষার আরবি প্রতিশব্দ ইলম বা জ্ঞান এবং বিশেষক্ষেত্রে হিকমত বা কৌশল হিসেবে এর প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে 'শিক্ষা' বলতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের 'বিকাশ সাধন' বা তার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার 'বহিঃপ্রকাশ' ও 'বাস্তবায়ন' বোঝায়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইংরেজি 'Education' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educere' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার ভাবার্থ হলো 'to bring up' অথবা 'to train' অথবা 'to mould' অর্থাৎ 'শিক্ষা' বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীকে 'লালন করা' অথবা 'প্রশিক্ষণ দেয়া' অথবা 'কোন কিছুর আদলে তৈরি করা'। (ঘোষ ও রায়: ১৯৮৭:১) আবার ল্যাটিন শব্দ 'Educo'-কে কেউ কেউ ইংরেজি 'Education' শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে 'E' অর্থ 'out' এবং 'duco' অর্থ 'to lead' হিসেবে গণ্য

www.amarboi.org

করা হয়েছে। ফলে এ ক্ষেত্রে কোন কিছু 'পরিচালিত করা' বা 'বের করা' বা 'প্রতিভাত করা'কে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে। (চৌধুরী: ১৯৮৩: ৩)

শিক্ষা সম্পর্কে ঋকবেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হলো এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'। (ঘোষ ও রায় : ১৯৮৭ : ১) ভারতীয় দর্শনে শিক্ষাকে আত্ম-পরিতৃপ্তি লাভের উপায় হিসেবেও দেখানো হয়েছে। দার্শনিক কণাদ এ অর্থেই শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। আবার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাকে মানুষের চরিত্র গঠন এবং পৃথিবী তথা সমাজ উপযোগী করার প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। চাণক্য বা কৌটিল্য শিক্ষাকে দেশসেবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ ও জাতির প্রতি যথার্থ ভালোবাসা প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর শঙ্কারাচার্যের মতে 'শিক্ষা হলো আত্মোপলব্ধির উপায়মাত্র।'

প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তাবিদগণও শিক্ষা বলতে প্রধানত মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর নৈতিক ও নান্দনিক জীবন বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

জাতিসংঘও শিক্ষার ধারণায় মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলির বিকাশ ও মানব উন্নয়নের উপায় হিসেবে গণ্য করে বলেছে, 'Education is the means for bringing about desired changes in behaviours, values and life style, and for promoting public support for the continuing and fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course... Education, in short is humanity's best hope and most effective means to the quest to achieve sustainable human development' (উদ্ধৃতি : লতিফ: ২০০৫ : ৮-৯) সাথে সাথে ইউনেস্কো জীবনযাপনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা ও উপলব্ধি অর্জনের নির্দেশনা হিসেবেও শিক্ষাকে গণ্য করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষ্য হচ্ছে, 'Education is Organized and sustained instruction designed to communicate a combination of Knowledge, skills and understanding valuable for all the activities of life.(UNESCO: 2002) জোহান হেনরিকের মতে 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ' (Education is natural, Harmonious and progressive development of man's innate power)-পেস্তালৎসি। জন ফেডারিক হারবার্ট বলেন- 'শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন'

www.amarboi.org

(Education is the development of moral character) পার্সি নানের ভাষায়-'শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে বোঝায় যার সাহায্যে সে নিজের সর্বোত্তম ক্ষমতা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে স্বকীয় অবদান রাখতে পারে' (Education is the complete development of the individuality of child, so that he can make original contribution to human life according to the best of capacity.

রিপোর্টে স্ববিরোধিতা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে স্ববিরোধিতা ফুটে উঠেছে। তাই এই রিপোর্টটিকে কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি হিসেবে গণ্য করা যায় না।

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, *"জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ প্রণয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে।"*
আরো বলা হয়েছে, *"এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেক্যুলার গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।"*

কিন্তু খসড়া রিপোর্টের 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' অধ্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদকে সুকৌশলে বিকৃত করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, 'এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেক্যুলার গণমুখী ...।' এখানে সংবিধানের শব্দ চয়ন **'একই পদ্ধতির গণমুখী'**কে সুকৌশলে **'সেক্যুলার গণমুখী'** বলা হয়েছে। অথচ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিষয়টি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪টি। যথা– ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহের ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস (খ) জাতীয়তাবাদ (গ) গণতন্ত্র (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র।সংবিধানের ৮(১এ) অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে, *"সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।"*

খসড়া রিপোর্টের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৩-এ, সুনাগরিকের গুণাবলির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি। কিন্তু সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ' ধারণাটি সম্পূর্ণ

www.amarboi.org

অসাংবিধানিক। আবার বাংলাদেশের নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, *"সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।"*

তাই বাংলাদেশের কোনো সুনাগরিকের জন্য সংবিধানের অধীনে থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ-এর মতো অসাংবিধানিক তথাকথিত সুনাগরিকের গুণাবলি বিকাশের কোনো সুযোগ নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-র সংজ্ঞা

ধর্মনিরপেক্ষতা ইংরেজি (Secularism)-র বাংলা প্রতিশব্দ। Sceular রাষ্ট্র দর্শনের অপর নাম Secularism. Secular অর্থ ইহলৌকিক, পার্থিব, পরকাল বিমুখতা ইত্যাদি।

"র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ"-এ Secular বা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যা ধর্ম সম্পর্কিত নয় (Not perlaining toor connceted with religious) এবং যা কোনো ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত নয় (Not belonging to a religious order)। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় (Rejects all forms of religious faith)। Encyclopedia of Britanica-র সংজ্ঞাও অনুরূপ। অর্থাৎ যারা কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, কোনো ধর্মের অনুসারী নন, কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এবং আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার বিরোধী তাদেরকেই বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। চেম্বারস ডিকশনারির মতে, "Education should be independent of religion" অর্থাৎ ধর্মনিপপেক্ষতাবাদ হচ্ছে এমন এক বিশ্বাস যার রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মমুক্ত থাকবে।

Oxford Dictionary-তে Secularism means the doctrine that morality should by besed sotely of regard to the wellbeing of mankind in the present life to be exclusion of all consideration draw from belief in god or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস বিবেচনা থেকে মুক্ত থেকে মানবজাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

প্রাচ্যবিদ ড. স্মিথের মতে-"The secular state is a state which guarantees of religion, deals with individuals as citizen irrest

www.amarboi.org

active of his religion is not constitutionally corrected to a particular religion nor does it seek either to promote or intyer fere with religion."

আবার এ মতবাদের অনুসারী (Secular) সম্পর্কে বলা হয়েছে, *"Not connected with spiritual or religious matter."*

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে Enlightenment Movement-এর জরায়ু ফেটে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-এর প্রসব ঘটে। Enlightenment Movement তথা মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে এর অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন দর্শন আমদানি করলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই; ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্তরের ব্যাপার; অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, যুক্তি (Logic)-ই জীবন পরিচালনার ভিত্তি হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা বা ওহির জ্ঞান (Divine Guidance)-এর কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপে এই আন্দোলনের সফলতার ফলে ধর্মহীন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, তাতে মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে গেল, ভোগবাদী হয়ে পড়ল, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। সর্বোপরি নীতিবোধের লোপ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ই এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেল। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কোনোভাবেই শিক্ষা ও শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে পারে না।

২. এ রিপোর্টের "জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।"

অথচ এই বিষয় বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাকে একটি বিদেশী ধারার শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে তাকে বিশেষ শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি ও পূর্ণ স্বাতন্ত্র দিয়ে সকল প্রকার পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে শত বছর ধরে চলে আসা মাদরাসা শিক্ষাধারার (যার সাথে জড়িত এ দেশেরই লক্ষ লক্ষ মানুষ) যাবতীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এর স্বনিয়ন্ত্রণ ও স্বকীয়তাকে বহুলাংশে সংকুচিত করা হয়েছে। এ নীতি দ্বিমুখী, স্ববিরোধিতাপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় আর সব বিষয়ের ব্যাখ্যায় আলাদা আলাদা অধ্যায় রাখা হলেও দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজি মাধ্যম ধারাটি সম্পর্কে কয়েক বাক্যেই সমাপ্ত করা হয়েছে, অথচ এখানে পড়ছে এ দেশেরই বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়েরা।

www.amarboi.org

আবার এ শিক্ষা ধারায় এ দেশের ঐতিহ্য শিক্ষাদান বা সংস্কৃতির ছোঁয়াও নেই। যে বৈষম্যহীন সমাজ এবং সম-মৌলিক নাগরিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, তা থেকে ইংরেজি মাধ্যমকে রেহাই দেয়া হলো কেন? তাদের কি জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই। বাস্তবতা হলো, এ দেশীয় বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রুচি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় না থাকায় ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরাই এ দেশে অন্য একটি Sub-Culture গড়ে তুলছে– যা আমাদের সমাজের সাথে খাপ খায় না। তারা বেড়ে ওঠে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে, যা জাতিগত ঐক্যবদ্ধতা ও চেতনার পরিপন্থী।

সুতরাং আমাদের এ ধরনের শিক্ষা ধারার বিষয়ে চিন্তাশীল বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কেউ যদি ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করতে চায় তবে তাদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত শিক্ষাক্রমের ইংরেজি সংস্করণ (national curriculum in English version)অনুসরণ করা যেতে পারে।

২. প্রস্তাবিত খসড়া রিপোর্টে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে। শুধু সাধারণ শিক্ষা ধারার মানবিক শাখা ও ভোকেশনাল শিক্ষার ৯ম-১০ম শ্রেণীতে একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। আমরা সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রত্যেক শাখা ও ভোকেশনাল শিক্ষায় পূর্বের ন্যায় **'ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা'**কে আবশ্যক বিষয় হিসেবে রাখার দাবি জানাচ্ছি। কারণ, এ রিপোর্টে শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, *"শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।"*

অন্যদিকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায় যে সাধারণ মাধ্যমিক স্তরের বয়ঃক্রম হলো নানাবিধ টানাপড়েনের সময়। মনো-দৈহিক বিশেষ পরিবর্তনের ফলে তারা বিপথে পা বাড়ায়, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে এ সময়টাতে খুব সহজেই বিকৃতি আর অনাচার বাসা বাঁধে তার মনে। এ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্ম-নিয়ন্ত্রয়ণ। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাই ব্যক্তিকে তার চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সুপথে পরিচালনা করে। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবই ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। ফলে সে নানা রূপ অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের আজকের সমাজ

www.amarboi.org

বাস্তবতা তারই প্রমাণ। কারণ, আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অপ্রতুলতা আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। আর আজকের উত্তপ্ত পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে সব স্তরের জন্যই 'ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা' অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যতম দার্শনিক শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাইদুর রহমান তাঁর 'An Introduction to Islamic Culture and Philosophy' গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে বলেছেন, 'Though himself unlettered (ummi) Muhammad (SM) was the first to realise the necessity of literacy.'

অধ্যাপক রেমন্টের মতে, 'Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to the physical, social and spiritual environment' (Raymont: 1963: 17)

এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। 'তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক জ্ঞান (Informative knowledge) যদি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) যদি সে অনুপাতে বৃদ্ধি না পায় তাহলে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বাড়িয়ে দেয়।' অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চরিত্রবান শাসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষার কথা বলেছেন, যার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। আধুনিককালের অনেক দার্শনিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। চরিত্রের বিষয়টি মূল্যবোধযুক্ত প্রপঞ্চ হওয়ায় দেশে দেশে চরিত্র গঠনের আদর্শ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। অ্যারিস্টটল মানুষের আচরণের প্রধান দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো 'প্রবৃত্তিতাড়িত ও বর্বরতা' এবং অন্যটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতা'। তাঁর মতে শেষোক্তটি হলো নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এবং এর বিকাশ সাধন করা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) মতে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তিনি 'Aesthetic Presentation' শীর্ষক তাঁর গবেষণা কর্মে উল্লেখ করেছেন, 'The one and the whole work of education may be summed up in the concept-morality.' তাঁর মতে আদিম ও নীচু প্রকৃতি অবদমন এবং উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে নৈতিকতা। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাবিদ চরিত্রের ধারণা প্রদান করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন ধারণা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির

www.amarboi.org

কতকগুলো দিককে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– (ক) জীবনে উচ্চ মূল্যবোধের উপলব্ধি ও চর্চা (Realization and practice of higher values in life), (খ) মনের প্রশিক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি (Training of mind or will-power), (গ) সুশৃঙ্খল সহজাত প্রবৃত্তি (discipline of instincts) এবং (ঘ) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে নৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করা (changing instinctive behaviour into moral behaviour)। পূর্বোক্ত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এসব দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

ধর্ম ও নৈতিকতা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এদের অবস্থান সর্বদাই পাশাপাশি। অনেকেই মনে করেন যে, নৈতিকতার উৎপত্তি ধর্মের এমন জায়গা থেকে যা কখনও আলাদা করার মতো নয়। নৈতিকতা মানুষের একটি সহজাত বিষয়। বয়সের সাথে সাথে এটা বিকশিত হয়ে কিছু বিষয়কে গ্রহণ এবং অনেক বিষয়কে বাদ দিয়ে একটা মানদণ্ডে পৌঁছায়, যাকে আমরা মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড বলি। মানুষে মানুষে এ আচরণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এসব কারণেই মানুষের বিবেক কিছু নৈতিক গুণাবলিকে ভালো বলে স্বীকৃতি দেয় এবং কিছু বিষয়কে মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করে।

নৈতিকতার উৎপত্তি ধর্ম থেকে

মিসরীয় দার্শনিক Professor Muhammad Kutub তার The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে বলেছেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের কাজ হলো পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করা, গড়ে তোলা এমন একটি লালন কর্মসূচি যা মানুষের দেহ, তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের একটিকেও পরিত্যাগ করে না, আর কোন একটির প্রতি অবহেলাও প্রদর্শন করে না।'

মানুষ বাইরে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটাতে পারে, কিন্তু ভেতরের মানুষকে সুন্দরতম হিসেবে বিকশিত করতে পারে না। সারাটা দুনিয়া আজ পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করে জাতে ওঠার চেষ্টা করছে অথচ পশ্চিম তার গগনচুম্বী উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দূরতিক্রম্য অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মানবিকতার এক করুণ সঙ্কট (Crisis) মোকাবেলা করছে। শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য আয়োজন সেখানে ডিগ্রির পাশাপাশি নৈতিকতাকে স্থান না দেয়ায় দামি দামি ডিগ্রির অভাব হচ্ছে না, ভৌতিক উন্নতি (Physical development) ঘাটতি হচ্ছে না, অর্থবিত্তের অভাব হচ্ছে না। অভাব হচ্ছে চিত্তের, মেধা ও মননের, মানবতাবোধ ও কল্যাণকামিতার, আস্থা ও নির্ভরতার। অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটা ছিল না।

www.amarboi.org

Education does not necessary mean mare acquisition of Degrees and Diplomas. It emphasizes he need for acquisition of knowledge to life a worthy life. শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কিছু ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অর্জন নয় বরং সম্মানজক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন।'

আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্ম ও নৈতিকতাবিহীন একটি কারখানায় পরিণত করেছি। ফলে আমরা স্কুল-কলেজে এ কথা লিখে রাখলেও প্রকৃতপক্ষে আমরা কোন বাস্তব ফল পাচ্ছি না। মূলত যেখানে ধর্ম উপেক্ষিত সেখানে সকল মহৎ চিন্তা, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও কল্যাণধারা অনুপস্থিত। ধর্মবোধ তথা স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যই মানুষকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, সৎকর্মশীল, জবাবদিহিতা ও বিনয়ী হতে শেখায়। বিখ্যাত মনীষী Sir Stanely Hull এর মতে, 'If you teach your children three R's : Reading, Writing and Arithmetic and leave the fourth 'R' : Religion, then you will get a fifth 'R' : Rascality.' অর্থাৎ 'যদি আপনি আপনার শিশুকে শুধু তিনটি 'R' (Reading, Writing, Arithmetic) তথা পঠন, লিখন ও গণিতই শেখান কিন্তু চতুর্থ 'R' (Religion) তথা ধর্ম না শেখান তাহলে এর মাধ্যমে আপনি একটি পঞ্চম 'R' (Rascality) তথা নিরেট অপদার্থই পাবেন।

ইসলাম: ইসলামের বক্তব্য হলো, এই পৃথিবী মহান আল্লাহর তৈরি; তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এই বিশ্বের পরিচালনা, সার্বভৌমত্ব এবং স্থায়িত্ব তাঁরই ওপর ন্যস্ত। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সব ধরনের সমস্যা, ভুল ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত এবং সদা পবিত্র। তাঁর প্রভুত্ব সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব এবং অবিচার থেকে মুক্ত।

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং সরল-সঠিক পথে চলাই হলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কোন্ ধরনের ইবাদত ও আনুগত্য করতে হবে সেটা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতাআলা মানবতাকে সঠিক পথনির্দেশনা দেয়ার জন্য আসমানি কিতাবসহ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

মানুষ তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং পরকালে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পৃথিবীতে মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকাল হলো পরকালের জন্য নিজেকে তৈরি করার একটা সুযোগ। মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজ, চলাফেরা, কথাবার্তা, চিন্তা, উদ্দেশ্য ও অনুভূতির পূর্ণ সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই তাকে পরকালে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কুরআন

www.amarboi.org

মাজিদ অনুযায়ী নৈতিকতার তিনটি উৎস রয়েছে এবং তা মানবপ্রকৃতির সাথে মিশ্রিত। যথা–

আত্মপরিচালনা: নিজেকে নিয়ন্ত্রণই আত্মপরিচালনা, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করে। আল কুরআনের বাণী, *"আমি আমার প্রবৃত্তিকে দোষমুক্ত বলে দাবি করছি না। প্রবৃত্তি তো মন্দের দিকে উসকাতেই থাকে। আমার রব কারো ওপর রহমত করলে আলাদা কথা। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।" (১২:৫৩)*

- **আত্মসমালোচনা:** এটি নৈতিকতার দ্বিতীয় উৎস, যার অর্থ হলো নৈতিকতার মাধ্যমে কাজের গুণাগুণ বিচার করা। যখন কোনো অশালীন কাজ সম্পন্ন হবে তখনই সেটা বিবেকের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে। প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে এই গুণের অধিকারী। আল কুরআনে এসেছে, *"আমি আরো শপথ করছি সে আত্মার, যা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।"* (৭৫:২)
- **সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ভালোবাসা:** আল কুরআনের ভাষায় *"(অপরদিকে) যারা বলে, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আমাদের মালিক, অতঃপর (এ ঈমানের ওপর) তারা অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে, (হে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দারা!), তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না; (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো (এবং আনন্দিত হও)।"* (৪১:৩০)

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী মানুষের ভাগ্যকে দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত থাকতে হয়। আর এ জন্য বৌদ্ধ ধর্মে জীবনে আটটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, যা নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। সেগুলো হলো– ১. বাস্তবতাকে গতানুগতিক দৃষ্টিতে না দেখা ২.আত্ম-অস্বীকৃতি, স্বাধীনতা এবং নির্দোষতার অভিপ্রায় ৩. সত্যবাদিতার সাথে এবং কাউকে আঘাত না দিয়ে কথা বলা ৪. কাউকে আঘাত না দিয়ে কাজ করা ৫. অহিংস জীবন যাপন ৬. আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করা ৭. চারপাশের বস্তুগুলোকে সতর্কতা এবং সচেতনার সাথে পর্যবেক্ষণ করা; কোনো ধরনের বিরক্তি ও ব্যগ্রতা ছাড়াই বর্তমান বাস্তবতাকে মেনে নেয়া ৮.সঠিক ধ্যান ও মনোযোগ।

এ ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মে পঞ্চশীলা বা পাঁচটি নৈতিক অনুশাসন মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। তা হলো– ক. জীব হত্যা না করা বা কষ্ট না দেয়া খ. চুরি না করা গ. ধর্মীয় বিধি ছাড়া যৌন সম্পর্ক পরিহার করা ঘ. মিথ্যা অথবা কষ্টদায়ক কোনো কথা

www.amarboi.org

না বলা ঙ. মদ ও মাদকজাতীয় দ্রব্য পরিহার করা, কেননা এটি সুস্থ চেতনাবোধ হ্রাস করে।

ইহুদি ধর্ম: ইহুদিদের ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টা ও নৈতিকতা থেকে উৎসারিত। ইহুদি ধর্মের ঐশ্বরিক আদেশ হলো–

১. আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো স্রষ্টা থাকবে না ২. নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করতে পারবে না; এদের কাছে মাথা নত বা কোনো পূজা করতে পারবে না ৩. তোমরা স্রষ্টার নামের অপব্যবহার করো না ৪. বিশ্রাম ও ছুটির দিনকে খেয়াল রাখতে হবে ৫. মা-বাবাকে সম্মান করো ৬. হত্যা করো না ৭. ব্যভিচার করো না ৮. চুরি করো না ৯. প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করো না ১০. প্রতিবেশীর সুখে ঈর্ষান্বিত হয়ো না। প্রতিবেশীর সম্পদ, স্ত্রী বা অন্য কোনো বিষয়ে ঈর্ষা পরিহার করো।

খ্রিস্ট ধর্ম: খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা সকল নৈতিকতাকে বাইবেল থেকে উৎসারিত বলেই মনে করেন।

মানব-উৎসর্গ, গণহত্যা, দাস ব্যবস্থা, নারী-বিদ্বেষকে সঙ্গতিপূর্ণভাবে স্থির করা হয়েছে। অব্যশই পিতা-মাতার প্রতি স্রষ্টার উপদেশ চিত্তাকর্ষকভাবে সহজ করা হয়েছে। যখন সন্তানেরা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন তাদের প্রহার করা উচিত। (প্রবাদ ১৩:২৪, ২০:৩০ ও ২৩:১৩-১৪)

যদি তারা (সন্তানেরা) লজ্জাহীন হয়ে স্পর্ধা দেখায় তবে তাদের হত্যা করো। (এক্সোডাস ২১:১৫, লেভিটিকাস ২০:৯, ডিউটারোনমি ২১:১৮-২১, মার্ক ৭:৯-১৩ এবং ম্যাথু ১৫:৪-৭)

আমাদেরকে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস, ব্যভিচার, সমকামিতা, ছুটির দিবসে কর্ম সাধন, সমাধিস্থ প্রতিচ্ছবির পূজা সাধন, জাদুর ব্যবহার এবং অন্যান্য মনোকল্পিত অপরাধের ক্ষেত্রে খুব কঠোর হতে হবে। থ্যাসালোনিয়াসে (একটি পবিত্র গ্রন্থ) বলা হয়েছে।

- (১:৭-৯) যিশু ও তাঁর শক্তিশালী দূত জ্বলন্ত আগুনে আসবে, যারা স্রষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞতা পোষণ করে এবং যারা যিশুর জীবনী শিক্ষা সম্বলিত নীতিমালা (গসফল) অনুসরণ করে না তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে।
- (১:৯) সেসব অবিশ্বাসীদের স্রষ্টার উপস্থিতিতে চিরস্থায়ী ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।
- (২:৮) তারপর তার খারাপ ও ক্ষতিকর কাজ প্রকাশিত হবে, স্রষ্টা তাদের মুখের গতিশীলতা নিঃশেষ করবে এবং তাদের আগমনের সম্ভাবনা ধ্বংস করবে।

www.amarboi.org

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্ম মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আত্মশুদ্ধি (ইয়ামা) ও নিয়ামা) হলো যোগ ও বেদান্ত মতবাদের মূল ভিত্তি। নৈতিকতাই হলো ধর্মের প্রবেশ পথ। যে নৈতিক ও আদর্শিক জীবন নির্বাহ করে সে মুক্তি ও মোক্ষ লাভ করে।

মূল্যবোধের চর্চা আপনাকে প্রতিবেশী, বন্ধুমহল ও পরিবারের সাথে ঐক্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ মূল্যবোধ 'সুখ ও মোক্ষ'কে দীর্ঘস্থায়ী করে।

প্রত্যেক ধর্মই নৈতিক উপদেশের শিক্ষা দেয়। যেমন–

"হত্যা করো না, আঘাত করো না, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, কখনো প্রতিবেশীর দোষ খুঁজিও না।"

হিন্দু ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে–

সব জায়গায় আত্মার পরিব্যাপ্তি রয়েছে। এটি হলো সকল জীবের অন্তর্নিহিত আত্মা। এটি সকল শ্রেণীর জন্য সচেতনতামূলক। যদি তুমি প্রতিবেশীকে আহত কর, প্রকৃতপক্ষে নিজেকে আহত করেছ। যদি তুমি অন্য সৃষ্টিকে আহত কর, তাও নিজেকে আহত করেছ। কারণ, পুরো বিশ্বই তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো নয়। অবশেষে বলা যায়, নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি (সৃষ্টিকর্তার) ওপর এক ধরনের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই আমাদেরকে তার আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি আমাদেরকে কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ধর্মসমূহ থেকে উপর্যুক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ জন্যই পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।"

এ খসড়া রিপোর্টের সংযোজনী ৩-এ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে 'ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা'কে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। শুধু মানবিক শাখা ও ভোকেশনাল শিক্ষায় একে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের সকল শাখা ও ভোকেশনাল শিক্ষার সকল শ্রেণীতে 'ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা'কে অবশ্যই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষার মানবিক শাখায় সামাজিক বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে, আবার নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ (যেমন– সামাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও ভূগোল প্রভৃতি) রাখা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে মানবিক শাখার আবশ্যিক বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে তথ্যপ্রযুক্তি বা সাধারণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রস্তাবিত খসড়ার সংযোজনী ৩-এ উল্লিখিত মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কতিপয় মৌলিক বিষয়কে সঙ্কোচন/পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কিংবা ঐচ্ছিক হিসেবে রাখা হয়েছে অথবা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়া হয়েছে। যার ফলে মাদরাসা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হাসিল বাধাগ্রস্ত হবে এবং এর মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। উল্লেখ্য, এ কথা সর্বজনবিদিত এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)-এর ২৭ পৃষ্ঠায় মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে,

"... শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম করে গড়ে তোলা, তারা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আর্দশ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বুঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়।"

কিছু সুপারিশ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করার জন্য নিম্নে কিছু সুপারিশ পেশ করা হলো:

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর চূড়ান্ত খসড়ার আলোকে আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৯%। নিরক্ষরদের অধিকাংশই আবার বয়স্ক। দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে উন্নত ও স্বনির্ভর জাতি গঠন সম্ভব নয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া) রিপোর্টে বয়স্ক সাক্ষরতার কথা বলা হলেও এর পূর্ণ সাফল্যের জন্য কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ না থাকায় আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পেশ করছি– দেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতা দূর করে শত ভাগ সাক্ষর জাতি হিসেবে পথ চলার লক্ষ্যে এবং সাংবিধানিক (১৭ নং অনুচ্ছেদ) দায়বদ্ধতা পূরণার্থে নির্দিষ্ট ৩/৪/৬ মাসের জন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত রেখে Summer/Winter Schooling-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সময়ে সারা দেশের উচ্চ স্তরের (সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহ, মেডিকেল কলেজসমূহ প্রভৃতির) সকল

www.amarboi.org

শিক্ষার্থী একযোগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট সম্মানীর বিনিময়ে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। এ অভিযানে অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ক্রেডিট হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অভিযান চলাকালীন সময়টুকু তার চাকরির বয়সের সীমা থেকে বাদ যাবে।

- ❖ সমকালীন প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য উচ্চ শিক্ষা স্তরে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Medium of Instruction হিসেবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- ❖ মাতৃভাষায় উন্নত যোগ্যতা সৃষ্টি ও জ্ঞানচর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনার্স পর্যায়ের সকল বিষয়ে ইংরেজির পাশাপাশি ১০০ অথবা ২০০ নম্বরের বাংলা সংযোজন করতে হবে।
- ❖ অনার্স পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের ন্যায় বিগত স্তরের শিক্ষাধারা ও ফলাফলের চেয়েও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বাস্তব যোগ্যতার বিচারকেই মুখ্য করে তোলা উচিত।
- ❖ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)-এর ১৪ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, *"মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্ত্যক্ত না হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।"* এ ক্ষেত্রে মেয়ে শিক্ষার্থীদেরকে উত্ত্যক্তকারীর জন্য শাস্তির বিধান রাখার পাশাপাশি আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে মার্জিত ও লালিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সার্বজনীন ড্রেস কোড প্রবর্তন করা যেতে পারে।
- ❖ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া)-এর ৪৯ নং পৃষ্ঠায় নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ৫ নং ক্রমিকে বলা হয়েছে, *"প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে যথাযথ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।"*

  আমরা মনে করি, নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন আনয়নের জন্য সকল প্রকার গণমাধ্যমে নারীকে পণ্যরূপে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে, আকাশ সংস্কৃতিকে সার্বজনীন শালীনতা ও আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফির ওয়েবসাইটসমূহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।
- ❖ শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতির প্রবর্তন করতে হবে। ছাত্ররাজনীতির নামে অ-ছাত্রদের রাজনীতি, চাঁদাবাজি ও সাধারণ ছাত্রদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় নয় বরং যোগ্যতাকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে

www.amarboi.org

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরিবর্তন বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকার এবং সরকারদলীয় মন্ত্রী-এমপি ও নেতা-নেত্রীদের অনৈতিক, অবৈধ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষানীতিতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুশিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযোগ্য ব্যবহার অপরিহার্য। শিক্ষার অভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে সৃজনী শক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উন্মেষ ঘটানোই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মনকে করে সুন্দর, উদার ও সহানুভূতিশীল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে সচেতনতা সৃষ্টি শিক্ষার ভিত্তিকে মজবুত করে। শিক্ষা যদি জীবনে কাজে না লাগে, শিক্ষা যদি সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ না হয়, শিক্ষা যদি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে এ শিক্ষার কোন অর্থ নেই। অর্থবহ ও কল্যাণমুখী শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগ ঘটায়, মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজনের সমুদয় বিষয়গুলোর সঠিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। নীতিবোধকে পরিস্ফুট এবং দৃঢ়তর করে তোলার পরিপূর্ণ শিক্ষা ইসলামী বিধিবিধানেই নিহিত। শিক্ষা মানুষের অপরিহার্য ন্যায্য অধিকার। প্রতিটি নর-নারীর জন্য এ অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান ইসলামেরই বলিষ্ঠ ঘোষণা : "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই শিক্ষা ফরজ।" প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য প্রাণীর শিশুর মতোই মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়। তাই শিক্ষার মৌলতত্ত্বের উপরই নির্ভর করছে একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি।

সরকার এই উপলব্ধিকে সামনে রেখেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আর এর ব্যতিক্রম হলে এর মাশুল দিতে হবে গোটা জাতিকে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

www.amarboi.org

বাম রাজনীতির খপ্পরে ধরাশায়ী আওয়ামী লীগ

শুরুতেই প্রাসঙ্গিক বিষয়ে একটি অপ্রাসঙ্গিক গল্প মনে পড়ল। একটি গরু একত্রে দুইটি বাচ্চা প্রসব করেছে। বাচ্চা দুটির একটি দুর্বল আরেকটি সবল। বড় হওয়ার সাথে সাথে উভয়ের মধ্যে বাড়ছে প্রতিযোগিতার চেতনা। সবল বাচ্চাটি বলল, চল আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা দিই। শারীরিকভাবে দুর্বল বাচ্চাটির বুদ্ধি ছিল সবল বাচ্চার তুলনায় প্রখর। দুর্বল বাচ্চাটি চিন্তা করলো প্রতিযোগিতায় নামলে আমি নিশ্চিত হেরে যাব। তাহলে কি করা যায়? একদিন দু'দিন করে সময় কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে। একদিন হঠাৎ করে চমৎকার একটি বুদ্ধি আটল দুর্বল বাচ্চাটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিব ঠিকই কিন্তু হারা যাবে না। তাহলে সে প্রতিযোগিতা কী? এরপর দুর্বল বাচ্চাটি সবল বাচ্চাটিকে বলল, চল ভাই দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে শক্তি ক্ষয়, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি, সমাজে হেয় প্রতিপন্ন, হার-জিতের লজ্জা এসব কিছু না করে আমরা এমন প্রতিযোগিতা দিই যার মধ্যে আমাদের কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। সবল বাচ্চাটি বলে উঠল, বাহ্ চমৎকার তো? তাহলে বল সে প্রতিযোগিতাটা কী? দুর্বল বাচ্চাটি বলল, সেটি হচ্ছে শুয়ে শুয়ে লেজ ঘুরানোর প্রতিযোগিতা। সুঠাম দেহের সবল বাচ্চাটি দুর্বল বাচ্চাটির বুদ্ধির মারপ্যাঁচে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাধ্য হলো। এ সিদ্ধান্ত তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনল। আস্তে আস্তে সবল বাচ্চাটি দুর্বল হয়ে পড়ল। হারিয়ে ফেলল তার আসল শক্তি। আজকে বর্তমান ১৩ দল মিলে তেমনি আওয়ামী লীগকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে অন্য প্রতিযোগিতায় মনোনিবেশ করানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

আজকের ১৩ দল পুরনো আওয়ামী লীগের প্রসবকৃত সন্তান ইতিপূর্বের আওয়ামী লীগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগই বাংলাদেশের একমাত্র দল যে দলকে এদেশের ৯৯% ভাগ মানুষ সমর্থন করেছিল। কোনো না কোনোভাবে সমর্থন এবং সম্পৃক্ততা ছিল গণমানুষের। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষকদের মতে ১০০ বছরের রাজনীতির ইতিহাসে আওয়ামী লীগেরই রাজনৈতিক বিপর্যয় হয়েছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। যা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত থাকার দীর্ঘ সময়টিও ছিল নজিরবিহীন। আবার ২১ বছর পর ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিপর্যয় হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কেন? একথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের বিপর্যয় হয়েছিল গডফাদার, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ডাকাতি, লুটপাট, হত্যা, রাহাজানী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ ইত্যাদি কারণে। তার চেয়ে বড় সত্য কথা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ভাঙনের মত বিপর্যয়ের কারণ আজকের ১৩ দল নামে খ্যাত এই

www.amarboi.org

বন্ধুরাই। আজকে বিএনপির সদ্য প্রসবকৃত এলডিপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ যতটুকু আনন্দিত তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত তার পূর্বে প্রসবকৃত ১৩ সন্তানকে নিয়ে, যারা ইতিপূর্বে আওয়ামী বিপর্যয়ের খলনায়ক। সেই খলনায়কদের বুদ্ধিবৃত্তিক বেড়াজালে আক্রান্ত আজকের আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র কতটুকু লালন করে সেটি বড় কথা নয়; তার চেয়ে বড় কথা হলো তারা নিজেদেরকে অধিক গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে। কিন্তু আ'লীগ বিগত দিনগুলোতে সেটি যেমন প্রমাণ করতে পারেনি তেমনি তাদের বর্তমান কর্মসূচি, আচরণ, ভাষা আজকেও সেটি প্রমাণ করে না। আজকের অসহিষ্ণু রাজনীতিতে আ'লীগের দাবি কতটুকু যৌক্তিক কতটুকু অযৌক্তিক সে পর্যালোচনায় আমি যেতে চাই না। কিন্তু এটা ঠিক যে, আ'লীগের আজকের জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন, ভাষা আচরণ, হিংসাত্মক মানসিকতা, পাশবিকতা পুরোনো চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এদেশের আজকের প্রজন্ম আওয়ামী দুঃশাসনের ইতিহাস শুনেছে কিন্তু দেখেনি। ২৮ অক্টোবরের ঘটনার মাধ্যমে আ'লীগ নতুন প্রজন্মের কাছে তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছে। কিন্তু এর ইন্ধনদাতা কি আওয়ামী লীগ নিজেই? ঘটনার চক্রাবর্তে মনে হয় ১৩ দল আ'লীগের যতটুকু বন্ধু সেজেছে তার থেকে ক্ষতি করার দায়িত্ব নিয়েছে বেশি। তার প্রমাণ ২৮ অক্টোবর পল্টনে হৃদয়বিদারক দৃশ্যটি, যা বিশ্ব মানবতাকে করেছে বিস্মিত। মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করার পর তার লাশের উপর নৃত্য করার দৃশ্যটি, সে তো স্বাভাবিক নয়! এই নৃত্যাভিনেতা হলেন বামসংগঠনের নেতা-কর্মীরাই। আ'লীগকে একথা ভেবে দেখতে হবে যে, একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো পথ খোলা আছে কিনা। একের পর এক আ'লীগের অযৌক্তিক দাবি একথাই প্রমাণ করে আ'লীগ আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় না। তারপরও ডিমের যেমনি মাথা নেই তেমনি আ'লীগের দাবিরও তেমনি শেষ নেই। এরপরেও আ'লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিশ্বাস যতটুকু ছিল সর্বশেষ হাইকোর্ট রিটপিটিশনের মধ্য দিয়ে সেই গৌণ বিশ্বাসটিও অবিশ্বাসে পরিণত হল। জ্বালাও-পোড়াও, অবরোধ, ঘেরাও, লগি-বৈঠার ভয়-ভীতি দেখিয়ে নয় বরং এ মুহূর্তে আ'লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করার হিসাব নিকাশই তাকে কষতে হবে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী ১৪দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আ'লীগকে ঠিক করতে হবে তারা কি নির্বাচন করবে কি করবে না এ প্রশ্নটির উত্তর। ১৪ দলের সেই নীতি-নির্ধারণী কমিটিতে এ মুহূর্ত পর্যন্ত না'র পালাটিই ভারী। আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না একথাটি অগণতান্ত্রিক। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচে অযৌক্তিকতাকে যৌক্তিক

www.amarboi.org

আসনে বসিয়ে আন্দোলন করা– এটি অগণতান্ত্রিক। এর ইন্ধনদাতা কারা? এ পর্যালোচনায় চারদলীয় জোটকে মোকাবেলা করার জন্য যতটুকু পয়োজন তার থেকে বেশি দরকার আ'লীগের মতো একটি গণতান্ত্রিক পার্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক বেশি। কিন্তু এ মহাসত্যটির গুরুত্ব অনুধাবনে যারা আজ বন্ধুরূপী ভূমিকা পালন করছেন তারা হচ্ছে আওয়ামী বিপর্যয়ের এক সময়ের সবচেয়ে বড় শত্রু আজকের ১৩ দল।

যে সব কারণে আ'লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কোনো বিকল্প পথ নেই তা হলো:

ক. বিশ্বের মানচিত্রে নোবেল শান্তিবিজয়ী হিসেবে বাংলাদেশের ভাব-মর্যাদা আজ সমুন্নত। গোটা বিশ্বের মানুষের নজর আজ আমাদের দিকে। যে দেশটি শান্তি পুরস্কারের মত মূল্যবান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সেদেশে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী, অগণতান্ত্রিক, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থান নগ্ন চরিত্রই জাতি হিসেবে আমাদেরকে করেছে কলঙ্কিত। আর সেটি করপোরেশনের নাগরিক সংবর্ধনায় ড. ইউনূস ১৪ দলের প্রতি সংঘাতের পথ পরিহার করে অবরোধ প্রত্যাহারের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার সেই আহক্ষানই জানালেন। সুতরাং এ অবস্থা থেকে উত্তরণে আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। প্রথম আলো পত্রিকার জনৈক বিশিষ্ট কলামিস্ট লিখেছিলেন, আওয়ামী লীগ কিছু অর্জন করতে গিয়ে ২৮ তারিখে যে পৈশাচিকতা দেখিয়েছে তার মাধ্যমে অর্জনের তুলনায় হারিয়েছে অনেক বেশি। সুতরাং এটি শুধরে নিতে আওয়ামী লীগকে হতে হবে অনেক সংযমী, সহনশীল। কিন্তু আগামী দিনের অবরোধ ও কঠিন কর্মসূচি কি সেই সহনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ?

খ. আওয়ামী লীগ এদেশে একটি গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবে পরিচিত। একদলীয় শাসন বাকশাল কায়েম, রক্ষীবাহিনী গঠন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ নানাবিধ অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমে আ'লীগ বিতর্কিত। তাহলে বাকশালীয় কলঙ্কের যে অভিশাপ নিয়ে আওয়ামী লীগ আজও অভিশপ্ত আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে আজকের বিশ্বের কাছে আওয়ামী লীগ পরিচিত হবে গণতন্ত্র হরণকারী হিসেবে। যা বাকশালী চরিত্রেরই পূনরাবৃত্তি। বর্তমান বিশ্বের দরবারে গণতন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ ১৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ যখন ৭৫তম স্থানে অধিষ্ঠিত ঠিক সেই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক এ পথকে রুদ্ধ করার দায়ভারও আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে। অবরোধের মত একটি কঠিন ও ক্ষতিকর কর্মসূচি দিয়ে মানুষকে স্তব্ধ করে রাখা যায় কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার মধ্যে জনগণের সমর্থন রয়েছে। সুতরাং ভোটের রাজনীতিতে মনোযোগী হওয়া ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই।

www.amarboi.org

গ. লগি ও বৈঠার ভয় দেখিয়ে এবং অবরোধের মাধ্যমে সাবেক প্রধান বিচারপতি কে.এম হাসানকে বিব্রতবোধ করানো ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এ আজিজকে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা যতটা সহজ হয়েছে; কিন্তু অন্য কোনো দাবির প্রেক্ষিতে আগামীদিনে অবরোধ করা ততটুকু সহজ হবে না বরং আওয়ামী লীগের জন্য তা হবে বুমেরাং।

ঘ. আওয়ামী লীগের থিংক ট্যাংক হিসেবে পরিচিতি বিশিষ্ট কলামিস্ট আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ১৪ দলের সমন্বয়ক আব্দুল জলিলকে অবজ্ঞা করে লিখেছিলেন, "যে দেশে জলিলের মত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগের মত দলের সাধারণ সম্পাদক হয়, সেদেশের প্রতিপক্ষ দলকে আওয়ামী লীগ নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই। কারণ জলিল সাহেব যা বলবেন তার বিপরীতটা ধরে নেয়াই হবে প্রতিপক্ষের কাজ।" যেমন ৩০ এপ্রিল "ট্রাম কার্ড"। তারপরও আওয়ামী লীগের অনেক ডাকসাইটে নেতাকে বাদ দিয়ে শেখ হাসিনা আব্দুল জলিলের মত ব্যক্তিকে সাধারণ সম্পাদক করার কারণ হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগের বিপর্যয়কালীন সময়েও এম পি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং দলের মধ্যেও টিকে থাকা না থাকার মাপকাঠি হচ্ছে নির্বাচন। এরপরও আওয়ামী লীগ আজকে নির্বাচনবিমুখ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে কেন? কারণ হচ্ছে ১৩ দলসহ আওয়ামী লীগ বিগত দিনে জয়লাভ করতে পারেননি। এখন তারাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত। আর যারা নির্বাচিত তাদের সংখ্যা কম হলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের মৌনসমর্থন ভূলুণ্ঠিত, অগ্রাহ্য। সামনে এখন দেখার বিষয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে কারা বিজয়ী হয়।

আর যেসব কারণে বামরা বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিসহ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনবিমুখ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা হলো নিম্নরূপ :

ক. মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে বাম রাজনীতির শিকড় গভীরে না থাকায় বামরা প্রায় জনবিচ্ছিন্ন। ভোটের রাজনীতিতে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত। অনেকটাই ব্যানারসর্বস্ব বিদেশী প্রভুদের অর্থকড়ি দ্বারা পরিচালিত এই ১৩টি দল। কিন্তু সরকারবিরোধী আওয়ামী আন্দোলনের এ দুর্যোগ মুহূর্তে এ দলগুলো নিজেদের জনসমর্থনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে চাঙ্গা রাখতে অক্ষম হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনায় আওয়ামী আন্দোলনকে রেখেছে সচল। তাই আওয়ামী লীগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পকেট সংগঠনে রূপান্তরিত।

খ. ১৪ দলীয় জোটের যারা ভোটের রাজনীতিতে নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত মনে করে তারা নতুন চিন্তার নামে জাতীয় সরকারের ফর্মূলা দিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং জাতীয় সরকারের স্বপ্ন

www.amarboi.org

দেখাচ্ছে। তাহলেই শুধুমাত্র ভোটে অংশগ্রহণ না করে কোনো কিছু পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে এটি একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাঠে ময়দানে বামদের কোনো অস্তিত্ব না থাকায় আওয়ামী লীগের সাথে কোনো বাক-বিতণ্ডাও নেই। যে ক'জন আছেন তাদেরকে দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি করলেই তো আর লোকই থাকেনা। আমার বিশ্বাস স্বয়ং আব্দুল জলিল সাহেবও ১৩ দলের নাম বলতে পারবেন না আর দলের প্রধানদের নামতো দূরের কথা।

গ. ব্যানারসর্বস্ব বামরাজনীতি যে ক'জন নেতা নিয়ে টিকে আছে তার অধিকাংশই আওয়ামী রাজনীতি থেকে ছিনতাই করা কিংবা বহিষ্কার হওয়া। আর আগামীদিনেও নিজেদের দলকে সচল রাখতে হলে আওয়ামী লীগ থেকেই তাদেরকে লোক ভাগিয়ে নিতে হবে। এজন্য কেউ কেউ মনে করছেন যে আওয়ামী লীগের উপর ১৩ দলের প্রেতাত্মারা সওয়ার হওয়া আওয়ামী ধক্ষংসের শেষ পরিণতি। এর প্রমাণ হচ্ছে আজকের আওয়ামী লীগের ধক্ষংসাত্মক কর্মসূচি। কিন্তু একথা ঠিক যে, এ ধক্ষংসাত্মক কর্মসূচির কোনো পরিণতিই বাম নেতৃত্বকে বহন করতে হবে না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি, স্বনির্ভরতা অর্জন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জবাবদিহিতা এর কোনটির সাথে বামদের নেই যেমন সম্পৃক্ততা তেমনি নেই দায়ভারও। কিন্তু রয়েছে আওয়ামী লীগের। তাই আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করুক অথবা বিরোধী দলে থাকুক না কেনো জনগণের কাছে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আর এ জবাবদিহিতা উত্তর পদ্ধতিই হচ্ছে নির্বাচন।

ঘ. এখন বামদের ইন্ধনে হঠকারী এ আন্দোলনে যতটুকু টেস্ট পাচ্ছেন আ'লীগসহ ১৪ দল, তার থেকে অনেক বেশি কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তা থেকে বেরিয়ে আসার। প্রবাদ আছে, 'চুলকানীতে যত আরাম, পরবর্তী জ্বালায় ঘুম হয় হারাম'। তাই শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করুন। কথায় কথায় যেসব আওয়ামী ও বাম নেতারা গণঅভ্যুত্থানের কথা বলেন তাদের মনে রাখতে হবে জনজীবনে দুর্ভোগ ও হঠকারী আন্দোলন অব্যাহত থাকলে দেশের জনগণই ১৪ দলের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিতে পারে।

ঙ. বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩ দলের সারাদেশে মোট ভোটের পরিমাণ প্রায় সোয়া লক্ষ। অথচ এর থেকে বেশি ভোট পেয়ে একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার নজির অহরহ। সুতরাং নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বামরা কখনো যেতে আগ্রহী নয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, শেখ হাসিনা ও আব্দুল জলিল এখন অনির্বাচিত নীতি-নির্ধারকদের খপ্পরে আবদ্ধ। কেউ কি বলবেন ১৪ দলের নীতি-নির্ধারণী বৈঠকে যারা বসেন তাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি কতজন? আর এই অনির্বাচিত

www.amarboi.org

নীতি-নির্ধারকদের ইন্ধনেই আজ আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে এই অরাজকতা। আবার কেউ কেউ বিদেশী প্রভুদের সন্তুষ্টি ও বিভিন্ন সংস্থার এজেন্ট হিসেবে এদেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র, উন্নতি-অগ্রগতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধক্ষংস করার অপচেষ্টায় যে লিপ্ত নয় তাও হলফ করে বলা যায় না। আমার মনে হয় বাম রাজনীতির খপ্পরে আওয়ামী রাজনীতির এটিই হচ্ছে বৈচিত্র্যময় পতনের দৃশ্য। আর যারা নির্বাচন বিমুখতার অদৃশ্য শক্তি হিসেবে কলকাঠি নাড়ছেন সেই বাম নেতৃবৃন্দ তাদের সুযোগসুবিধা কানাকড়িতেই কুড়িয়ে নিচ্ছে। লোক নেই, জন নেই কিন্তু জনসভায় বিরাট বক্তব্য, মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার, পত্রিকায় কভারেজ সমভাবেই ভোগ করছে তারা। কথায় বলে, 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার'। আর এই নিধিরামরাই ১৪ দলীয় জোট এমপি মন্ত্রীর ভাগাভাগিতে কিছু না পেলেও যা পাচ্ছেন তার মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের সাথে ৫০ বছরের সশ্রম গোলামী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেও ভোট আর ত্যাগ সমান হবে না বরং বামদের ভোগ হবে বেশি। এছাড়াও আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনের পথ পরিহার করে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে তাহলে নব্য বাকশাল কায়েমের দায়ভারে তারা যেমনি অভিযুক্ত হবেন তেমনি নির্বাচনমুখী একটি দল হিসেবে পরিচিত নিজেদের নেতা-কর্মীকে আদর্শিক সূতার টানে কতটুকু টিকিয়ে রাখতে পারবেন সেটিই আজ একটি পর্যালোচনার বিষয়। নানা কারণে সদ্য বিএনপি থেকে যেমনি এলডিপির জন্ম হয়েছে তেমনি আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচনমুখী চেতনায় বিশ্বাসী আরেকটি সংগঠনের জন্ম হতে পারে!

সুতরাং আওয়ামী লীগের সামনে একটাই পথ সেটি হচ্ছে নির্বাচন। এছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। তাই বলছিলাম বাম রাজনীতির খপ্পরে আওয়ামী লীগের আজ এমনি ধরাশায়ী অবস্থা, যেমনি দুর্বল ও সবল বাচ্চা দুটির প্রতিযোগিতার কথা বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচে হেরে যাওয়ার ভয়ে দুর্বল বাচ্চাটি সবল বাচ্চাটিকে লেজ নাড়ানোর প্রতিযোগিতায় দিতে বাধ্য করেছিল। আওয়ামী লীগও যে আজ ঐ বাছুরের মত বামদের বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাঁচে হাবুডুবু খাচ্ছেন, এ কথাটা তারা কি ভেবে দেখবেন? নাকি আওয়ামী লীগ হবে আনলাকি থার্টিন!

নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৬

www.amarboi.org

২৮ অক্টোবর : ইতিহাসের কালো অধ্যায়

২৮ অক্টোবর, ২০০৬। অন্য দিনের মত একটি দিন, একটি মাস, একটি বছর নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিন কিন্তু বরণীয় নয়। এটি জাতীয় জীবনে একটি কালো অধ্যায়ের সংযোজন। এ দিনটি হয়তো বা পল্টন হত্যা দিবস, মানবাধিকার হত্যা দিবস, লগি-বৈঠার তাণ্ডব দিবস, আওয়ামী বর্বরতা দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকবে যত দিন পৃথিবী থাকবে। ইতিহাসে হিরোশিমা-নাগাসাকি, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি '০৯ বিডিআর হত্যাযজ্ঞ, ২৫শে মার্চের কালো রাত্রি, এপ্রিল ফুল দিবস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের স্মৃতিতে এক বীভৎস চিত্র ভেসে ওঠে। ঠিক তেমনি শত বছর পরও ২৮ অক্টোবরকে স্মরণ করলে শিউরে উঠবে মানুষের শরীর, বাকরুদ্ধ হবে তার বিবেক, কেঁদে উঠবে মন। অভিশপ্তদের ঘৃণা করবে বিশ্বমানবতা।

দিন যতই এগোচ্ছে ২৮ অক্টোবরের কলঙ্কের বোঝা ততই ভারী হচ্ছে। কারণ সুড়ঙ্গপথ ধরে যে দানব আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে তার আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বিগত জরুরি সরকারের সময়। সংস্কারের নামে দেশকে রাজনীতিশূন্য করার ষড়যন্ত্র, গ্রেফতার, হামলা, মামলা দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে চাঁদাবাজি, হিংসাত্মক প্রতিশোধ, হেয়প্রতিপন্ন করার মহোৎসব, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে দোকান-পাট ভাঙচুর, অসহায় মানুষের কান্নার রোল, অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, দেশের সচল অর্থনীতির গতিকে পিছিয়ে দিয়েছে ২০ বছর। তার পরও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এসব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ২৯ ডিসেম্বর '০৯ অংশগ্রহণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। প্রত্যাশা ছিল গণতন্ত্রের উত্তরণ। কিন্তু না! দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে ৮৭% ভোটের আজগুবি ফলাফল নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হলো মহাজোট সরকার। ধারণা করা হচ্ছিল বিগত ২ বছরের ঘটনা থেকে রাজনীতিবিদগণ শিক্ষা নিয়ে দেশ চালাবেন। কিন্তু দেখা গেল আওয়ামী লীগ বিগত কয়েক মাসে বিডিআর হত্যাকাণ্ড, টিপাইমুখ বাঁধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার, দক্ষিণ এশিয়া টাস্কফোর্স, এশিয়ান হাইওয়ে, সংবিধান সংশোধনী, শিক্ষানীতিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেনতেন নীতি অবলম্বন করে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বিরোধী সংগঠনের ওপর হামলা-মামলা নিত্য-নৈমত্তিক কর্মসূচি; এ ছাড়াও ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী ও জামালপুরের হাফেজ রমজান আলীকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দেশের

www.amarboi.org

প্রায় ৭৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। ছাত্রশিবিরের কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে আহত করা হয়েছে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে অনেককে। ২৮অক্টোররের লগি-বৈঠাধারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকলেও তা রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ দেয়ার উদ্যোগ সরকারের নব্য বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। আমি বিশ্বাস করি শহীদের রক্ত কথা বলে, এর আছে নিজস্ব এক শক্তি। ২৮ অক্টোবর ও ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারির সেনা সদস্যদের রক্তের বেড়াজাল থেকে আওয়ামী লীগ কখনও রেহাই পাবে না। জলিল সাহেবের বোমায় বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগ বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

২৮ অক্টোবর সংঘটিত ঘটনা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অনেক বক্তৃতা-বিবৃতি, বুকলেট, প্রতিবাদ, সিডি, ভিসিডি ওয়েবসাইট খোলাসহ নানা ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। আমার এই লেখাটি তারই অংশ। ঘটনার অনেক পরে আমার কয়েকটি কথা লেখার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সেদিন ঘটনার শুরু যেভাবে

সকাল ১০টা। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সেক্রেটারিয়েট সদস্য ভাইদের আসতে বলেছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি। দু-একজন করে আসছেন। হঠাৎ গেটের সামনে চিৎকার শোনা গেল। বেরিয়ে দেখি একজন ভাইকে রিক্সায় করে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে আসা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সভাপতিসহ আমরা কয়েকজন সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখছি অনবরত আহত ও রক্তাক্ত ভাইয়েরা আসছেন। গ্র্যান্ড আজাদ হোটেলের সামনে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে করণীয় ঠিক করা হলো। কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কিছুটা বিষণ্ন ও যন্ত্রণার চাপ অনুভব করলাম, যা অতীতে আর কোনদিন লক্ষ্য করিনি। কারণ এ সাহসী অকুতোভয় অবিচল আল্লাহর দ্বীনের জিন্দাদিল সৈনিককে দেখার সুযোগ হয়েছিল অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, নির্যাতন আর ১৫ জন শহীদের জীবন্ত ময়দান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। একদিন নয় দু'দিন নয় দীর্ঘ ৭টি বছর। তাই বুঝতে আর বাকি নেই পরিস্থিতি ভালো নয়। এদিকে এই ৫ মিনিট যেন ঘণ্টার মর্মবেদনা।

আহত ভাইদের সারি আস্তে আস্তে দীর্ঘ হচ্ছে। আর সহ্য করা যায় না। কেন্দ্রীয় সভাপতির হাতের ইশারায় অনুমতি পেয়ে দৌড়াচ্ছি পল্টন মসজিদের গলির দিকে। এ দিক থেকে কয়েকজন ভাই ডাকছে, আসেন। তখনও বুঝতে পারিনি সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মন্‌জু ভাইও এখানে আহত। কে যেন বলে উঠল, আহ্! মন্‌জু ভাইকে শেষ করে ফেলল। আল্লাহর দ্বীনের এই নির্যাতিত মানুষটির গায়ে আবারও ওরা আঘাত করেছে। তারা তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা নিয়ে তার ওপর লগি-বৈঠার চরম আঘাত চালিয়েছে। লাঠি-বৈঠার

www.amarboi.org

আঘাতে জর্জরিত করেছে সারাটি দেহ। শুধু তাই নয় এর আগেও তিনি এরকম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কয়েকবার। যে আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি এখনও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না। এ দৃশ্য দেখতে না দেখতে জড়িয়ে পড়লাম পরিস্থিতি মোকাবেলায়। এদিকে ৪০-৫০ জন ভাই, অপরদিকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে অস্ত্র, লাঠি, বোতল, বোমা ইত্যাদি নিয়ে। এমন কোনো অস্ত্র নেই যা তারা ব্যবহার করেনি। যে ইটগুলো তারা আমাদের দিকে মারছিল সেইগুলো তুলে আমরা আবার তাদের দিকে ছুড়ে মারছি। এভাবে একদিকে সন্ত্রাসীদের মারণাস্ত্রের হামলা অন্য দিকে আমরা নিরস্ত্র। এই নিরীহ মানুষগুলো ৭ ঘন্টা মোকাবেলা করেছিল। ওরা এক ইঞ্চি জায়গা থেকেও সরাতে পারেনি আল্লাহর দ্বীনের গোলামদের। এ তো আল্লাহর দ্বীনের পথে এগিয়ে যাবার এক ঐতিহাসিক দিক-নির্দেশনা। বাতিলের বিরুদ্ধে এক চরমপত্র। ১৪ দলের গালে একটি চপেটাঘাত। জীবন দেয়ার প্রতিযোগিতা। ঈমানদারদের জন্য এটি বিরাট সুযোগ। আগামীর পথে এক দুরন্ত সাহস। এক সময় আমি নিজেও মনে করতাম অস্ত্রের মোকাবেলায় টিকে থাকা যায় না। কিন্তু রাবিতে সে ভুল কিছুটা শুধরে নিয়েছি, বাকিটুকু পরিশুদ্ধ করেছি ২৮ অক্টোবরের ঘটনায়। আল্লাহর প্রত্যক্ষ মদদের বাস্তব সাক্ষী! ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলছে। কেউ কেউ আহত হচ্ছে নতুন করে, দু-একজন করে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা এর থেকে বাড়ছে না। কারণ 'বিজয় তো সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়।'

হঠাৎ চিৎকার শুনলাম টুটুল ভাইকে মারছে। এ কথা শুনে উপস্থিত ভাইদের উদ্দেশে বললাম, 'আপনাদের মধ্যে যারা জীবন থাকা পর্যন্ত পিছিয়ে আসবেন না তারা হাত তুলুন এবং সামনে আসুন।' ১৫-২০ জন ভাই এগিয়ে এলেন। নারায়ে তাকবির ধ্বনি দিয়ে যখন আমরা এগোতে লাগলাম তাদের ৪-৫ হাজার লোক পেছনে যেতে লাগল। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলে তাঁর সাহায্য অনিবার্য। এটাই তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোনো মু'মিন মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে নারায়ে তাকবির বাতিলের মনে চার হাজার লোক তাকবির উচ্চারণ করলে যে আওয়াজ হয় তার সমপরিমাণ ভীতি সৃষ্টি হয়।" ২৮ অক্টোবর হাতে-নাতে তার প্রমাণ পেয়েছি।

যাক, সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখি গলির একটু ভেতরে পড়ে আছে আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ মুজাহিদের লাশ। হায়েনারা তাকে হত্যার পর ফেলে রেখেছে গলির মধ্যে। কয়েকজন মিলে ধরে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রক্তপিপাসু আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলা তখনও থামেনি। লাশের ওপর তারা ছুড়ে মারছে ইট, পাথর, বোতল, লাঠি। তখনো ঠিক বুঝতে পারিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা মুজাহিদ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ জান্নাতের মেহমান হিসেবে তাকে কবুল করেছেন। পরে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে শুনলাম মুজাহিদ আর

www.amarboi.org

নেই। তখন স্মৃতিতে ভেসে উঠলো সব ঘটনা। এখন মিলিয়ে দেখলাম যে মন্জু ভাইয়ের আহত হওয়া আর মুজাহিদের শাহাদাতের ঘটনা ছিল একই সময়। মুজাহিদ শাহাদাতের পূর্বে ডায়েরিতে লিখেছিল– "আমার প্রিয় দায়িত্বশীল সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মজিবুর রহমান মন্জু ভাই"। হজরত তালহা (রা) রাসূলে করিম (সা)-কে রক্ষা করার জন্য একাই নিজের শরীরে অসংখ্য তীরকে বরণ করেছিলেন। আর সেই চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ মুজাহিদও নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রিয় দায়িত্বশীলকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে চিৎকার করে বলেছিল আমি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছি কিন্তু এখানেই বিদায়।

এ পর্যায়ে দীর্ঘ ৫ ঘণ্টার পর গুলি আমার বাম পায়ে আঘাত হানল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গাড়ির চাকা পাংচার হওয়ার মত লুটিয়ে পড়লাম হাঁটুর ওপর ভয় করে। জাহেদ হোসেন ভূঁঞা ভাই ও আব্দুল মান্নান ভাইসহ কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। পায়ের যন্ত্রণায় যতটুকু কাতর তার থেকে বেশি কষ্ট লাগছে এই ধন্য মানুষগুলোর কাতার থেকে এই অধমের বিদায় নিতে হচ্ছে বলে। তখন নিজেকে খুব স্বার্থপরই মনে হচ্ছিল। সবাই যখন জীবনবাজি রেখে ভূমিকা রাখছে তখন আমি চলে যাচ্ছি অন্যের কাঁধে ভর করে। গুলিবিদ্ধ পা-টি ঝুলছে আর সেই সাথে রক্ত ঝরছে। কষ্টের মধ্যেও নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলাম। অনেক ভাই পেরেশান হয়ে গেল এবং দলবেঁধে আমার সাথে আসতে লাগল। কিছুটা ধমকের সুরে বললাম, এতজন কোথায় যাচ্ছেন? পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। সেখানে দায়িত্বশীল হিসেবে আমি, জাহেদ হোসেন ভূঁঞা ভাই এবং শেখ নেয়ামুল করিম ভাই ছিলাম।

নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। এ যেন আরেক কারবালা। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতেও দারুণ শৃঙ্খলা এ শহীদি কাফেলার ভাইদের মাঝে। এখানেও ইয়ামামার যুদ্ধের সেই সাহাবীদের অপর ভাইকে অগ্রাধিকারের দৃষ্টান্ত। নিজেদের কষ্ট হচ্ছে, রক্ত ঝরছে তবুও ডাক্তারকে বলছে ঐ ভাইকে আগে চিকিৎসা করুন। এ যেন 'বুন ইয়ানুম মারসুস'-এর উত্তম দৃষ্টান্ত। এ যেন আনসার মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের জীবন্ত দলিল।

জোহরের নামাজ আদায় করলাম অপারেশন থিয়েটারে গুলিবিদ্ধ পা প্লাস্টার করা অবস্থায়। নিজের অজান্তেই ভাইদের জন্য দুয়া করতে লাগলাম। প্লাস্টার করছেন ডাক্তার। এক্স-রে রিপোর্ট ঝুলানো, দেখা যাচ্ছে পায়ের হাড় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। কেউ যেন বলতে চেয়েও আমি ভয় পাব সে জন্য আর কিছু বলতে চায়নি। আমি বললাম, এই গুলিটি আমার জন্য আল্লাহ কবুল করেছিলেন। শুধু তাই নয়, গুলিটি আমার পায়ের নামেই লেখা ছিল। আর এ বিশ্বাস থাকতে হবে প্রতিটি আল্লাহর

www.amarboi.org

দ্বীনের সৈনিকের। এই বিশ্বাসের ইমারতের ওপর যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ওপর আঘাতের পর আঘাত এলেও তাকে কখনো স্তব্ধ করা যাবে না।

আজ হয়ত কেউ কেউ বলেন আমাদের প্রস্তুতির কথা। কিন্তু আমি দ্বিমত পোষণ করি। কারণ দীর্ঘ ৭ ঘন্টা যাদের সাথে আমরা মারামারি করেছি, কী তাদের পরিচয়? দলে তারা আওয়ামী লীগ কিন্তু ভাড়াটে সন্ত্রাসী, টোকাই, গার্মেন্টস কর্মী ও পতিতালয়ের হিন্দা। মুখে রুমাল, কোমরে মাফলার, খালি গায়ে মারামারিতে অংশ নিয়েছে ওরা। আমাদের প্রস্তুতি আরো ভাল হলে সেদিন লাশের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত। আর এ ধরনের সন্ত্রাসী একজন টোকাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া, নামাজী, আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের লাশ সবাই একই হিসেবে মূল্যায়ন করতো। হিসাব হতো কাদের লাশ কয়টি। দেশী এবং আন্তর্জাতিকভাবে দেখা হতো সেভাবে। অন্তত আল্লাহতায়ালা সে কলঙ্কের হাত থেকে এ আন্দোলনকে রক্ষা করেছেন। বিশ্বের মানুষ চিনতে সক্ষম হয়েছে উগ্র ও জঙ্গি কারা। আল্লাহ যা করেন তার মধ্যে এই আন্দোলনের কল্যাণ নিহিত।

আল্লাহ বলেন, "আর বিপদ কখনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আসে না।" এটিই চিরন্তন সত্য। আমাদের কারো হিসেবে যেটি বিপদ, কেউ নিচ্ছেন আবার পরীক্ষা হিসেবে। কেউ নিচ্ছেন পরিশুদ্ধতা হিসেবে। আবার কেউ মনে করেন এটিই আমাদের পাওয়া। এটিই ইসলামী আন্দোলন। ১৯৮৯ সালের ১৮ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলিবিদ্ধ হয় রোজাদার শহীদ শফিকুল ইসলাম। হাসপাতালে সবাই চেষ্টা করছেন তাকে সুস্থ করার। কিন্তু সেদিন শফিকুল ইসলামের আকুতি ছিল এরূপ, "ভাই! আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি ঠিক, কিন্তু শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেক দিনের। সুতরাং আমাকে রোজাদার অবস্থায় শহীদ হওয়ার সুযোগটুকু করে দিন।" এ কথা বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন। এই তো তার প্রস্তুতি!

কিন্তু আমি জানি না ২৮ অক্টোবরের ঘটনা পর্যালোচনা ১৪ দল কিভাবে করছে। হাসপাতালে শত শত দর্শনার্থী। এতো দর্শনার্থীর ধাক্কায় রোগী কাবু কিন্তু করার কিছু নেই। এটি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এই পৃথিবীতে ভালোবাসা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলেই আমরা মানুষ। হাসপাতালে আহতদের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে কেউ কেউ বলতে থাকেন– আহ্, সেদিনের প্রস্তুতি আরেকটু ভালো হওয়া দরকার ছিল। এতগুলো ফুটফুটে ছেলে আমাদের ভুলের কারণে বিদায় নিল। আচ্ছা আপনারা জানতেন না এভাবে হামলা হবে? আবার কেউ কেউ বলছেন, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। আওয়ামী লীগ আবার '৭২, '৭৩-এর বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। জোটের মজবুতি বৃদ্ধি পেল। জোট সরকারের ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ ও দ্রব্যমূল্যের কথা মানুষ এখন ভুলে গেছে। আগামী নির্বাচনে বিজয়ের জন্য এটাই যথেষ্ট। আবার কেউ কেউ এ খবরও দিচ্ছেন

www.amarboi.org

অনেকে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ছেড়ে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একজন অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ করে হাসপাতালে অচেতন হয়ে ফ্লোরে পড়ে মাথা ফাটিয়ে আরেক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এ হচ্ছে মানবীয় পর্যালোচনার হিসাব নিকাশ। আর আল্লাহর হিসাব তো ভিন্ন।

আজ যদি বলা হয় এই দুনিয়ার বিবেচনায় ২৮ অক্টোবর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কে? কেউ বলবে, শহীদ মাসুম, শিপন, মুজাহিদ, রফিক, ফয়সলের পরিবার। কিন্তু না। এটি আপনার হিসাব হতে পারে তবে শহীদ পরিবারের অনুভূতি ভিন্ন। কিন্তু তা অবিশ্বাস্য। তারপরও শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের ফরিয়াদ : আল্লাহর দরবারে আমার স্বপ্ন ছিল আমি শহীদের মা হবো, আল্লাহ যেন আমাকে একজন শহীদের মা হিসেবে কবুল করেন। শিপন সবসময় সত্যকে সত্য জানতো, মিথ্যাকে মিথ্যা জানতো। শহীদ সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ মাসুমের গর্বিত মায়ের আহ্বান : আমার জীবনের আশা ছিল আমার ছেলে খালেদ বিন ওয়ালিদ হবে, নিষ্পাপ হবে। আমার ছেলে হাসান-হুসাইনের মত হবে। আমার আরেক ছেলে শামসুল আলম মাহবুব। সবসময় দোয়া করতাম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তারা যেন গাজী কিংবা শহীদ হয়। সত্যি আমার প্রার্থনা আল্লাহপাক কবুল করেছেন। আমি মনে-প্রাণে সর্বদা আশা পোষণ করতাম মাসুম যেন ময়দানে সবার আগে থাকে। আল্লাহপাক আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমি আমার সাইফুল্লাহর রক্তের বিনিময়ে এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এই প্রার্থনা সবসময়ে করি। শহীদ ফয়সলের গর্বিত মা অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ঠিক এভাবে, তাদের কথা শুনেই মনে হয় তারা সত্যিই ইব্রাহিম (আ)-এর উত্তরসূরি। হযরত ইসমাইল (আ)-কে আল্লাহর পথে কুরবান করে ইব্রাহিম (আ) যেভাবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিক তেমনি তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ আমার এই সুশিক্ষিত বিনয়ী, ভদ্র, শান্ত, অমায়িক ও সুন্দর আচরণবিশিষ্ট সন্তানকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। আমার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় সন্তানকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতার চাওয়া : আমার ছেলে আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসেবে কবুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। কুড়িগ্রামবাসী সবাই তার জন্য কেঁদেছে। জীবনে সে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়নি। সে সব সময় সৎ সঙ্গে মিশত এবং দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকত। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা যাদের পিটিয়ে হত্যা করেছে, লাশের ওপর নৃত্য উল্লাস করেছে, ভেঙে দিয়েছে দাঁত, উপড়ে ফেলেছে চোখ; তারা হয়তো বা ভাবতে পারে এর মধ্য দিয়ে তাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু জয়-পরাজয়ের হিসাব-নিকাশ এই পৃথিবীতেই শেষ নয়। বরং তাদের এই একটি আঘাত আল্লাহর দ্বীনের সৈনিকদের করেছে জান্নাতের কাছাকাছি। আর তাদের

www.amarboi.org

অনেককে করেছে জাহান্নামের নিকটবর্তী। যারা আঘাতের পর আঘাত চালিয়েছে এ নিষ্পাপ মানুষের দেহে তারা কি আজ উত্তর দিতে পারবেন হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মায়ের জিজ্ঞাসার, 'কী অপরাধ আমার সন্তানের? তাকে হত্যা করা হয়েছে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। এ জন্য আমি গর্বিত। কিন্তু কেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার সন্তানের দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে? এই মুখ দিয়ে তো সে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুখস্থ করেছে। যাদের বুকের ওপরে নৃত্যউল্লাস করা হয়েছে, তারা কি জানে যে কপালে লাথি মারা হয়েছে সে কপালে দিনে পাঁচবার করে আল্লাহকে সেজদা করতো! পড়তো তাহাজ্জুদ নামাজ। যে হাত ভেঙে দেয়া হয়েছে সে হাত দিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতো। যে পা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে সে পা দিয়ে আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করতে যেত।' এ হাজারো জিজ্ঞাসার জবাব আজ তাদের কাছে আছে কি? যারা সেদিন আমাদেরকে পিছিয়ে দিতে এসেছে তারা আমাদেরকে অনেক পথ এগিয়ে দিয়েছে। আরেকবার আমরা দেখে নিয়েছি আমাদের পরীক্ষিত নেতৃত্ব। যাদের সাহস আমাদের এগিয়ে দেয়। যাদের আল্লাহর নির্ভরতা এ কাফেলার কর্মীদের আশান্বিত করে। যাদের ত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা দেখেছি তাদেরকে। আমরা দেখছি তাকে যাকে ঘিরে এ জনসভার আয়োজন। শ্রদ্ধেয় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবকে। মুহুর্মুহু গুলি আর বোমা স্তব্ধ করতে পারেনি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠকে। যা ছিল তেজোদীপ্ত, নিশ্চল, অবিরত আর অবিচল। তিনি যেন মাওলানা মওদূদীর অবিকল প্রতিচ্ছবি। এমনি এক জনসভায় অবিরাম গুলিবর্ষণ চলাকালে মাওলানা মওদূদীকে বসে পড়ার জন্য অন্যরা অনুরোধ করলে দৃঢ়তার সাথে তিনি বলেছিলেন, আমিই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে? তাই বিশ্বাস শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না, একদিন কথা বলবেই।

আমাদের প্রিয় নবী রাসূল করিম (সা) মক্কা থেকে দ্বীনের যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেননি। হিজরত করেছেন মদিনায়। ইসলামকে অল্প সময়ের মধ্যে বিজয়ের মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের সূচনা করেছিলেন। সে অনুসারে ইসলামী ছাত্রশিবিরও ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাত আর অনেক জুলুম-নির্যাতন থামিয়ে দিতে পারেনি এ কাফেলাকে। আজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক অপ্রতিরোধ্য সংগঠনের নাম বালাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আমার বিশ্বাস– মক্কা বিজয়ের মত ঢাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রক্তঝরা খুন আর ২৮ অক্টোবর পল্টনের শাহাদাতের নজরানার মধ্য দিয়ে এ জমিনে বিজয়ের সূচনা হবে। হে বিস্তীর্ণ আকাশ ও জমিনের মালিক! তুমি আমাদের ফরিয়াদকে কবুল কর।

অক্টোবর ২০০৭

www.amarboi.org

আবদুল জলিলের বোমায় বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগ

২৫ সেপ্টেম্বর প্রায় সকল জাতীয় পত্রিকার খবরের শিরোনাম ছিল আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপদেষ্টা আবদুল জলিলের লন্ডনে দেয়া বক্তব্য। কয়েকটি জাতীয় দৈনিক খবরটি শিরোনাম করেছিল। বেশির ভাগ সংবাদপত্র খবরটি প্রথম পাতায় বড় আকারে ছেপেছে। আর একটি প্রত্রিকা বেমালুম খবরটি চেপে গেছে। এটা সংবাদপত্রের এক প্রকার দুর্নীতি। লন্ডনে বাংলা টিভি ও বিডি নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এসব বক্তব্য দেন জলিল। তিনি বলেন আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পেছনে সমঝোতা ছিল, শেখ হাসিনার সঙ্গে বিরোধে না যাওয়াই ছিলো ভুল। মন্ত্রিসভার ৯০ ভাগ সংস্কারপন্থী, আশরাফ ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। ঐ সাক্ষাৎকারে জলিল আরও বলেন, কাউন্সিলের তিন দিন আগে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনার সঙ্গে বিরোধে না জড়ানো তার ভুল ছিল। নেত্রীর প্রতি বেশি আনুগত্যই তার কাল হয়েছে। আর তার পুরস্কার ৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে দলের পক্ষে শান্তি পেলেন। তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, উপদেষ্টা থেকে কাজ করার কোন অবকাশ নেই। শেখ হাসিনার তল্পিবাহকদের প্রেসিডিয়াম সদস্য আর একজন কম বয়সী লোককে (আত্মীয়কে) দলের সাধারণ সম্পাদক করে (তাদের) প্রতি চরম অবিচার করা হয়েছে। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগের এটি বোঝাপড়া হয়েছিল- বিশিষ্ট কলামিস্ট এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন- আমরা যা শুনেছিলাম এবং যা অনুমান করতাম জনাব জলিলের বক্তব্যে তার প্রমাণ মিলেছে। জনাব জলিলের বক্তব্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে দল হিসাবে আওয়ামী লীগের রূপ। আওয়ামী লীগ একটি নীতি নির্ভর দল নয়। আওয়ামী লীগ চায় ক্ষমতা। আওয়ামী লীগ চায় কেবল ক্ষমতার রাজনীতি, সামাজিক অভাব পূরণের রাজনীতি নয়। আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আঃ জলিল দলের ত্যাগী নেতা হওয়ার পরও তার একটি বড় পরিচয় সে বাংলাদেশের নাগরিক। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই জলিল সাহেব হয় এমন বক্তব্য দিয়েছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে ডাক্তারের ভুলে রোগী মারা যায়, ইঞ্জিনিয়ারের ভুলের কারণে দালান কোঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রাজনীতিবিদদের ভুলের কারণে একটি জাতি বিপর্যস্ত হয়। বিগত দিনে ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠার তাণ্ডবে প্রকাশ্যে মানুষ মারার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনীতিবিদরা যে অবৈধ লোমহর্ষক, অমানবিক যাত্রাপথে রওয়ানা হয়েছেন তা আজও অব্যাহত। আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে ১/১১ জারজ অশ্বডিম্বের প্রসবকৃত কুসন্তান আজকের মহাজোট সরকার। ম ইউ আহমদের অবৈধ ধারণকৃত ক্ষমতায় প্রসবকৃত সরকারকে দেশের মানুষ সন্দেহের চোখে দেখছে প্রথমদিন থেকেই। ৮৭ শতাংশ ভোট, অবৈধ ব্যালট যত্রতত্র পাওয়া, ভোটার থেকে

www.amarboi.org

কাস্ট বেশি হওয়া, ডিজিএফআই'র নির্বাচনের দিনের রহস্যময় ভূমিকা, নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা, এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

দেশের মানুষ মহাজোটের অস্বাভাবিক বিজয়কে কারচুপির নির্বাচন মুখে বললেও কার্যত এর বিপক্ষে বিরোধী দল কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। মাত্র ৮-৯ মাসের সরকার বিডিআর হত্যাকাণ্ড, টিপাইমুখ বাঁধ, তেল গ্যাস চুক্তি, এশিয়ান হাইওয়ে, বিতর্কিত শিক্ষানীতির মত এ জাতীয় ইস্যুকে বিরোধী দল কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়াও হামলা মামলা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুণ্ঠন, দখলের মাধ্যমে গোটা দেশ হয়ে উঠেছে আবু গারিব কারাগারের মত বীভৎস।

ঠিক বর্তমান সময়ে আবদুল জলিলের সমঝোতায় আর আঁতাতের অভিযোগ সরকারের থলের বিড়াল বেরিয়ে এসেছে। স্বৈরাচার সরকারের জুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় নির্যাতিত ও বঞ্চিতের কণ্ঠস্বরে বিরোধী দল। কিন্তু আমাদের দেশের বিরোধী দল বিগত ৮/৯ মাসের যে প্রবোধটুকু দেশের নির্যাতিত বনি আদমকে দিতে পারেননি আঃ জলিল সাহেব তা দিলেন এক মুহূর্তে। আঃ জলিল সাহেবর কিছু পাপ অন্তত এই অমোঘ সত্যের মাধ্যমে আল্লাহ হয়ত মোচন করে দিতে পারেন। প্রবাদ আছে "ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাই না" আঃ জলিল সাহেবের সরকারের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ যখন তুললেন তখন সবাই ব্যস্ত তার পানিসমেন্ট আর পদত্যাগ নিয়ে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে নিউইয়র্ক সংবাদ সম্মেলন করে বক্তব্য দিতে বাধ্য হলেন আঃ জলিল সাহেবের প্রতি-উত্তরে। কিন্তু লেজে গোবরে করে ফেললেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ সাহেব বেশি বিশ্বস্ততার প্রমাণ করতে গিয়ে বললেন "ইচ্ছা করলে শেখ হাসিনা নির্বাচন ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন সে অফার তাকে দেয়া হয়েছে"। তাহলে এতে কি প্রমাণ হয় না এমন সব অবৈধ কথাবার্তা নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে দেনদরবার হয়েছে? তাই তিনি সে অফার গ্রহণ না করে তথাকথিত সাজানো পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পথ বেছে নিলেন এতে কি বুঝা গেল? তার মানে শেখ হাসিনা একটু ঘুরিয়ে ক্ষমতায় এলেন। তাহলে সৈয়দ আশরাফ ও আঃ জলিলের বক্তব্যের পার্থক্য কোথায়? কই আমরা একদিনও শুনিনি খালেদা জিয়ার মুখে এমন বক্তব্য। তাকে এমন অবৈধ অফার দেয়া হয়েছে। বরং তিনি প্রথম দিন থেকেই দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও এর ঘোষণা দিয়ে চলেছেন। খালেদা জিয়ার আপসহীনতা ও শেখ হাসিনার আপসহীনতার পার্থক্য তো এখানেই।

থলের বিড়াল একটা বেয়ারা হলে শায়েস্তা করা যায় অনেক.. হলে!, এখনো তোফায়েল, আমু, রাজ্জাক সাহেবরা কিছু বলছেন না। মাঝে মধ্যে বাতাস দিচ্ছেন মাত্র। বঞ্চিত সকল গডফাদার তো আছেনই বহাল তবিয়তে। শেখ হাসিনা যাদের নিয়ে বর্তমানে দেশ চালাচ্ছেন তা এসি রুমের নেতা। সরকারের রাজপথের সময় সামনে বাকি দিল্লি আসলে বহুদূর। তাছাড়া শেখ মুজিবকে দিয়ে বাকশাল কায়েম

www.amarboi.org

যে জনপ্রিয় মানুষটি যেমনি শূন্য করে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছিল বামপন্থী মিউনিস্টরা তাদের চর বর্তমানে প্রভাবশালী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। তার শেখ হাসিনাকে শুন্য করে ছাড়বে এটা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

অনির্বাচিত So-called ফখরুদ্দীন ও ম ইউ আহমেদদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকলে জলিল সাহেবকে হয়তবা তোফায়েল, আমু, সুরঞ্জিতদের মত জেলের বাইরেই থাকার সুযোগ থাকত। জলিল সাহেবকে শুধু জেলেই যেতে হয়নি সহ্য করতে হয়েছে বৃদ্ধ বয়সে অসহ্য নির্যাতন। তিনি দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য রেখেছিলেন বলেই। ডিজিএফআইয়ের সাথে আঁতাত করেননি বলেই। এশটি গণতান্ত্রিক দেশে অগণতান্ত্রিক মানুষিকতা সবাই লালন করতে পারে না। কারণ দেশের ক্ষমতাহরণ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন কখনও এক বিষয় নয়। শেখ মজিবের বাকশালী মানসিকতা অন্ধ ভারতপ্রীতির কারণে মওলানা ভাসানীর মত নেতৃত্বকে আওয়ামী লীগের কেউ কেউ অস্বীকার করলেও ইতিহাসে তার স্বাভাবিক অবস্থান বিরাজমান। মহাজোট রহস্যপুরুষ এরশাদ সাহেব সেনাবাহিনীর ওপর কৃতজ্ঞ থাকার কথাকে আওয়ামী পন্থী মিডিয়া ফলাও না করলেও জলিলের সত্য কথাকে কিভাবে প্রচার না করে থাকতে পারবে? সত্যের ভেতেরও থাকে আরেক সত্য। রাস্তায় রশিকে সর্প-ভাবতে পারে দৃষ্টি বিভ্রমেরা। কিন্তু সর্পকে কিভাবে রশি ভাববেন? সেখানেই যত বিপত্তি। আর সেই কারণেই মিডিয়ার প্রচার বন্ধ বা কখনও বন্ধ করার হুমকি। আঃ জলিল বাংলাদেশের একজন স্বাতন্ত্র নাগরিক হিসেবে কিভাবে সেনাবাহিনীর নব্য স্বৈরাচার মইনের পীঠবাঁচাও নীতিকে সমর্থন করবেন। যদিও মহজোট নেত্রী ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই অবৈধ সরকারকে বৈধতা দেবার ঘোষণা দিয়েছিলেন। চোখ বন্ধ করে ফখরুদ্দীন ও মইনের বিচারের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি দাসসুলভ মনোবৃত্তি যার প্রমাণ টিপাইমুখ ড্যাম নিয়ে দেশের এক্সপার্টদের মতামতকে অগ্রাহ্য এবং সেই সাথে পিনাকের ঔদ্ধত্য আচরণকে মুখবুজে সহ্য করা। বিডিআর হত্য কাণ্ডের সাথে ভারতের সম্পর্ক থাকাকে আওয়ামী লীগ কোনভাবেই আমলে নেয়নি। অথচ পৃথিবীর এমন কোন সভ্যজাতি নেই যারা সীমান্তরক্ষীদের যাদের কারণে সীমান্ত পাহারা দিতে হয় তাদের সাহায্যে গড়ে তুলতে চায়। (ক্ষমতায় বসে চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রকে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্র নাম দেয়া ভারতপ্রীতির হীন মানসিকতা যা আওয়ামী এবং দলীয় প্রধান শেখ মজিবের মেয়ে শেখ হাসিনার জন্যই কেবল মানানসই)। স্বাধীনতা উত্তর নতুন বাংলাদেশে শেখ মুজিবকে বলা হয়েছিল আপনি শুধু বাকশালী মনোবৃত্তি ত্যাগ করুন বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে গান্ধীজির মত সম্মানিত করে রাখবে, মুজিব পারেনি কিভাবে পারবেন হাসিনা? সে কারণে ভারত আজ আমাদের বিরোধী দলকে শাসায় এই বলে হাসিনা সরকারের কিছু হলে ভারত চুপ করে থাকবে না। কোন অধিকারে, এ কথা ভারত বলতে পারে? জেনারেল মইন র-এর এজেন্ট সেখান থেকেই সমোঝতা। যার সুষ্ঠু

www.amarboi.org

প্রমাণ জলিলের সাহসী বক্তব্য। শেখ মুজিবের বাকশালী রক্তের প্রবাহ শেখ হাসিনার মধ্যে থাকলেও জলিলের মধ্যে না থাকাটাই স্বাভাবিক সে কারণে জলিল মুখ খুলতে পেরেছে। একদিকে হাসিনার মাথায় দাদাদের আশীর্বাদ অপরদিকে বামদের হাতে বন্দী হাসিনা। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা যদি ভারত এবং বাম রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের করার কিংবা বলার কিছুই নাই। তবে সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে যে বাস্তবতা মানুষ মেনে নিয়েছে তা হল শিয়াল কখনও মুরগির বন্ধু হতে পারে না। দেশ এবং জনগণের স্বার্থে কথা আমাদের বলতেই হবে। জনতাই এ লড়াই চলবেই এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

১. নগ্ন ভারতপ্রীতি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ঐতিহ্য যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তার নির্মম পরিণতি আ: জলিলদের মত ত্যাগী নেতার বিদায় কিংবা বহিষ্কারে শেষ হবে না। রাজনৈতিক অঙ্গনে ত্যাগের মুল্যায়ন যদি শেষ হয় তখন স্বাবাভিকভাবে নেতা-নেত্রী হয়ে ওঠে স্বার্থপর সেটার দিকেই আওয়ামী লীগে অগ্রযাত্রা।

২. সমঝোতা করে গণতন্ত্রকে হত্যা করার মাধ্যমে স্বৈরাচারের সাথে হাত মিলিয়ে আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র হরণ চরিত্রের বহি:প্রকাশ জাতি অবস্যই নীরবে সহ্য করবে না।

৩. জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির প্রতিবাদ সভায় পুলিশি হামলা জনগণের ধৈর্যের সীমা অবশ্যই অতিক্রম করবে।

৪. বিরোধী দলের প্রতি অগণতান্ত্রিক মনোভাব দলবাজি চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি মাস্তানি নিয়োগবাণিজ্য প্রভৃতি দুর্নীতি সহায়ক এবং কুকাজে আওয়ামী নেতাদের দুর্বার জড়িয়ে পরা সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদী করে তুলছে। এত সবের পরেও জলিল সাহেবের সত্য স্বীকারোক্তি জাতির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্ষমতালোভী হাসিনাদের কুকর্মের দলিল হিসেবে প্রকাশিত হল যা নতুন করে দেশের মানুষকে গণতন্ত্রের পথে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা দুর্নীতি, দুর্বল ও অদক্ষ নেতৃত্বসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক পাশ্চাৎগামিতা সাংস্কৃতিক পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি সমস্যা দিনদিন প্রকট আকার ধারণ করছে। ক্ষমতার প্রতি সীমাহীন লোভ জাতীয় ও মৌলিক স্বার্থ থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের চালকদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ঐকমত্যের স্বাভাবিক ভিত্তি তৈরি করতেও ব্যর্থ হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি দেশ ও দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি পরের চিন্তায় রাষ্ট্র চালনার দুর্বল মনোবৃত্তি নাগরিকের মানসিক চেতনায় চরমভাবে আঘাত করে, আর সেখান থেকে সূত্রপাত হয় বিদ্রোহের। আর এ বিদ্রোহের আগুনে কত কাল যে জ্বলতে হবে দেশের মানুষকে তা কে জানে! সেপ্টেম্বর ২০০৯

www.amarboi.org

অকুতোভয় মাহমুদুর রহমান

ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "তোমার মতামতের সাথে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার আমি জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।" জনগণ ইচ্ছামত সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি জনমত। তাই মত প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকতে হবে। সাংবাদিকরা হলো জাতির দর্পণ। তারা একটি দেশের চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরেন। কেউ অন্যায় করলে সাংবাদিকরা সত্য লেখতে চাইলে তার বিরুদ্ধে লেখতেই হবে। এটা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারও বটে।

প্রতিটি জাতির কিছু মানুষ আছে যারা কোন একক নয়, তারা দেশ ও জাতির সম্পদ, যারা নিঃস্বার্থভাবে একটি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে থাকেন। সে রকম একজন মানুষ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে নিজের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে চলেছে নির্ভেজাল ও অকুতোভয় সৈনিক, সাবেক জ্বালানি উপদেষ্টা, আমার দেশ পাবলিকেশন্স এর চেয়ারম্যান, পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, বিশিষ্ট কলামিস্ট, প্রকৌশলী জনাব মাহমুদুর রহমান। ব্যক্তি জীবনে তার সততা প্রশ্নমুক্ত। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে যার অসামান্য অবদান রয়েছে। বিগত দিনের সেনাসমর্থিত অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে যিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন। এ রকম নিঃস্বার্থ অকুতোভয় কিছু সৈনিক একটি নিরীহ জাতির শক্তির উৎস। একটি দেশ, জাতি, দল যখন বিশেষ ক্ষেত্রে একজন দক্ষ মানুষের প্রয়োজন অনুভব করেন তখন সেই অবস্থানের বাইরে থেকে লোক এনে অভাব পূরণ করা হয়। বাংলাদেশের লেখনির জগতে তাই ঘটেছে। বিগত সেনাশাসন আমলে যখন আধিপত্যশালীদের বিরুদ্ধে কলম ধরার মত লোক ছিল না তখন জাতি প্রকৌশলী থেকে সাংবাদিক করেছিল তাকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কথা বলা পত্রিকা দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক যখন হাল ছেড়েছিলেন তখন আমার দেশ পরিবার মাহমুদুর রহমানকেই সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মাত্র দুই বছরে দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে কথা বলে দেশ ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আর ঠিক সেই সময়ে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনায় অতি সম্প্রতি বিমানবন্দর এলাকায় কতিপয় দুর্বৃত্তরা তার গাড়িতে হামলা চালিয়েছে। অবশ্য হামলাকারী ও এই ঘটনার পরিকল্পনাকারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। এই মহৎ ব্যক্তির গাড়ির কিছু ক্ষতি হলেও আল্লাহ তাকে হেফাজত করেছেন। কিন্তু এমন একজন মহৎ ব্যক্তির ওপর এ ধরনের হামলার প্রতিবাদ করার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

www.amarboi.org

বিগত জরুরি অবস্থায় বাংলাদেশকে রাজনীতিশূন্য করার হীনচক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন, বজ্রকঠোর। তার লেখনীর মাধ্যমে সচেতনও ঐক্যবদ্ধ করে তুলেছেন দেশের জনগণকে। জরুরি অবস্থার সময় বাংলাদেশের অনেক রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীরা যখন ফখরুদ্দীন, ম. উ আহমদ এবং হাসান মশহুদের স্তুতিতে ব্যস্ত তখন মাহমুদুর রহমান তার শক্ত লেখনী দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছেন তাদের অবৈধ ক্ষমতার মসনদকে। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের তথাকথিত সুশীল ও ভারতের অনুচর "র" এর এজেন্টদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা উত্তর সর্বপ্রথম কলমই ধরেননি বরং তথাকথিত সুশীলদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। জরুরি অবস্থার অবৈধ সরকারের যম ছিলেন মাহমুদুর রহমান।

এ জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেন, "জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত তাদেরকে শাসন করার অধিকার কারো নাই"। জনগণের রায় যেহেতু ক্ষমতার মূলভিত্তি তাই গণতন্ত্রে সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না। জনসাধারণের মতের বা স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করলে সরকার শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। আবার সরকার স্বৈরাচারী হলে জনগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে উৎখাত করতে পারে। প্রয়োজনে জনগণ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে। এ জন্য আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি নব্য স্বৈরাচারী মইন উ আহমেদর বিচার। কেননা বিগত সেনাসমর্থিত অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে দেশ ২০ বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল গঠন মতপ্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত থাকে। জনগণ প্রয়োজনে দল গঠন এবং যে কোন দলের সমর্থক হতে পারে। রাষ্ট্রেবিরোধী দল অবশ্যই থাকবে। বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মেনে না নিলে তা গণতান্ত্রিক শাসন হতে পারে না। কোন দলে অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অস্তিত্বকে বিপন্ন করা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। অথচ সংস্কারের নামে রাজনৈতিক দল গুলে কে খণ্ডবিখণ্ড করা হয়েছে। আর ঠিক সেই সময় মাহমুদুর রহমান, ফরহাদ মাজহার, আসাফুদ্দৌলা, নুরুল কবীর ছিলেন জনতার পক্ষে। অথচ ইতিমধ্যে সাবেক সচিব আসাফুদ্দৌলা, নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবীর সাহেবের ওপর হামলা করা হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাহলে কি প্রশ্ন জাগে না! এর পেছনের শক্তি আসলে কারা? কেন বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে? কেন বের হচ্ছে না এর আসল রহস্য।

প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় দলই রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবে। কিন্তু দল ও রাষ্ট্রের পার্থক্যের জায়গাটি কোন দল ক্ষমতায় আমার পূর্ব পর্যন্ত দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে ঠিকই কিন্তু দল যখন

www.amarboi.org

শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে তখন সে আর দল নয় সে নিজেই রাষ্ট্র। তখন, তাকে হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ওঠে ভূমিকা রাখতে হবে। নিজেকে করতে হবে সবার জন্য উদার আর পরিহার করতে হবে দলীয় সংকীর্ণতা। আর যে সরকার দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারবে না, তার নিকট ফ্যাসিস আচরণ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। সেই ফ্যাসিস্ট দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ।

মাহমুদুর রহমানের মত ক্ষণজন্মা মানুষদের এই অবহেলিত জাতির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যিনি একাধারে প্রসাশক, সংগঠক, লেখক, সততা এবং সাহসের ধারক ও বাহক। এতোগুলো গুণের সমন্বয় একজন মানুষের জীবনে সত্যিই দুর্লভ। এটি আল্লাহর বিরাট বড় নিয়ামত ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তাকে দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেকে আরও ভূমিকা পালনের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। দেশের মানুষ তার জন্য দোয়া করছে।

তাই আমরা সরকারের নিকট দাবি জানাবো অবিলম্বে মাহমুদুর রহমানের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। আমরা মাহমুদুর রহমান সাহেবকে বলব আপনি এগিয়ে যান, আপনার সাথে আছে দেশের কোটি কোটি মানুষের দোয়া ও ভালোবাসা।

সেপ্টেম্বর ২০০৯

www.amarboi.org

বিতর্কিত সিইসি'র বোধোদয় আদৌ হবে কি?

সমগ্র বাংলাদেশ যখন নতুন করে আশায় বুক বাধছিল একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনকে নিয়ে তখন নির্বাচন বানচাল করার জন্য সিইসি নতুন করে প্রতারণায় নেমেছে। সীমানা নির্ধারণ, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ইত্যাদির দোহায় দিয়ে নির্বাচন বানচালের বিষয়টিকে যৌক্তিক হিসেবে দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চায়। তিনি প্রথম বির্তকিত হন একটি দলের আন্দোলনের ফল হিসেবে নিজের অভিষেককে উলেখ করার মাধ্যমে। বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে দলের মহাসচিবকে বাদ দিয়ে একজন ব্যক্তিকে সংলাপের আহবান জানিয়েছিলেন। বিশ্বের সকল মানুষ ও স্বীকৃত সংস্থাসমূহ একবাক্যে ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বললেও সিইসি ৭০-এর নির্বাচনকে নিরপেক্ষ বলার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক পরিচয়দানের অভিনব কারিশমা দেখল গোটা জাতি। সিইসিচেয়ারে বসার পর থেকেই দেশের ইসলামী দলসমূহের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে থাকে যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটান গত রমজান মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী দলগুলিকে উদ্দেশ্য করে বাংলা সিনেমার সস্তা ডায়ালগের মত মিথ্যা ডায়ালগ দিয়ে। সংলাপ থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে বাদ দেওয়ার বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত আবার নিবন্ধন নিয়ে নতুন করে নাটক মঞ্চস্থ করতে ব্যস্ত সিইসি। তারই ফল হিসেবে কিছু বামপন্থী দলের বিরোধীতাকে ইস্যু করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন না দেওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে নেই। অপরদিকে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে যা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী। ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না এই নীতিতে আওয়ামী লীগের কোন বিকল্প নেই। বরং আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা থাকায় নিম্নোক্ত কারণে আওয়ামী লীগ নিবন্ধন পেতে পারেনা-

উক্ত সংগঠনটি বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৮(১)-এর (১ক) আর্টিক্যাল এর পরিপন্থী। আওয়ামী লীগ তাদের সংশোধিত সংবিধানে এই মূলনীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে কোন ধারা সংযোজন করেনি।

১. এছাড়া মূলনীতি ৮(১)-এর (২) আর্টিক্যাল অনুযায়ী রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'-কে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সকল কার্যের ভিত্তি বলা হয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগ এর পরিপন্থী আদর্শের ধারক। সুতরাং সংবিধান বর্ণিত ধারার বিপক্ষে থাকায় আওয়ামী লীগকে নিবন্ধন দেয়া যেতে পারে না।

২. ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ঢাকা পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশ থেকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লগি-বৈঠা নিয়ে ২৮ অক্টোবরের সমাবেশে আসার নির্দেশ দেন।

www.amarboi.org

এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে তার দলীয় সন্ত্রাসীরা ২৮ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে ঢাকার রাজপথে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে এবং গুলি করে নির্মমভাবে ৬ জনকে হত্যা করে। সে হত্যার দৃশ্য দেখে সারা পৃথিবীবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এর পর ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি পর্যন্দ সারা দেশে আরো প্রায় ৫৪ জনকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে, গুলি করে এবং ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। মানবতা হত্যাকারী এই সংগঠনকে নিবন্ধিত করা হলে দেশের জনগণের বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে।

৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ২০০০ সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে তার দলীয় কর্মী ও সন্ত্রাসীদেরকে নির্দেশ দেন 'একটা লাশের বদলে দশটা লাশ পড়বে' -এই বলে। তার দেয়া এই নির্দেশ অনুযায়ী ২০০০ ও ২০০১ সালে সারা দেশে অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়।

৪. ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সরকারি রক্ষীবাহিনীর নেতৃত্বে সিরাজ সিকদারসহ ৩০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যসৈনিক এই মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারী আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতিতে নিবন্ধিত হলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

৫. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যাকারী। ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েম এবং ৪টি বাদে সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করে তারা স্বাধীনতার মাধ্যমে অর্জিত গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সুতরাং গণতন্ত্র হত্যাকারী কোন সংগঠন এই নিবন্ধন পেতে পারে না।

৬. বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী কাউকে হত্যার হুমকি প্রদান করা অপরাধের শামিল এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ২০০৬ সালে লাগাতার অবরোধ চলাকালীন সময়ে 'গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে', 'ভোট দিতে গেলে জান মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেবে না', 'অক্সিজেন বন্ধ করে দেয়া হবে' ইত্যাদি ধরনের হুমকি প্রদান করে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। উলেখ্য যে, জঙ্গী সংগঠন জেএমবি এ ধরনের হত্যাকান্ড ও হুমকি দিয়ে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং বিচারের মাধ্যমে তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লগি-বৈঠার নৈরাজ্যের মাধ্যমে ঠিক একই ধরনের অপরাধ করেছে। সুতরাং জেএমবি-র মত আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তাদের নেতাদের বিচার করা উচিত।

. আওয়ামী লীগ দেশের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার প্রতি হুমকি। ১৯৯৬ সালে একমাস চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেয় এবং জনতার মঞ্চের মাধ্যমে সারাদেশ অচল করে দেয়। অন্যদিকে ২০০৬ সালে লাগাতার অবরোধ সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক গতিকে বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী ১৪ দল। সূতরাং দেশের আর্থিক খাতের উপর সরাসরি হুমকি সৃষ্টিকারী এই দল কোনমতেই নিবন্ধন পেতে পারে না।

৭. আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ধর্ষণ করে সেঞ্চুরি উৎসব পালন করে যা মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং নারী সমাজকে অবমাননার শামিল। এছাড়াও ছাত্রলীগের হাতে খুন হয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

এবার আসা যাক নাম সর্বস্ব বাম রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রের দিকে। এসব গঠনতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে যা বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এরপরেও সিইসি আওয়ামীলীগ এবং তাদের সমর্থক পরগাছা বাম রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে বেশি উৎসাহী। যে সিইসি'র দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই তার দ্বারা অন্তত দেশের জন্য কল্যাণকর কোন পদক্ষেপ আশা করা যায় না। যেখানে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে নিবন্ধন থেকে বাদ যাবার কথা আওয়ামীলীগ এবং বাম দলগুলোর সেখানে অযৌক্তিকভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধন না দিতে নানামুখী অপচেষ্টায় লিপ্ত সিইসি। সর্বশেষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ সিইসি'র পদত্যাগ দাবি করেছেন। বেগম খালেদা জিয়ার এই সাহসী উচ্চারণকে দেশের মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতোপূর্বে এই সরকার জাতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার যতবারই উদ্যোগ নিয়েছে তার বলিষ্ট আওয়াজ সব থামিয়ে দিয়েছে। তিনি সকল জুলুম নির্যাতন মোকাবেলা করে দেশপ্রেম আর ঐক্যবদ্ধ জাতি আর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীকে ভূষিত। তার নেতৃত্বেই আবার সোনালী সূর্য উদিত হবে বাংলার আকাশে, বিদায় নেবে সকল অন্ধকার, মুক্তি পাবে সকল জনগণ।

বাংলাদেশের সকল সচেতন নাগরিকই জানে আগামীর নির্বাচন না হওয়ার অর্থই দেশকে মহা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়া। দেশকে মহা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবার চূড়ান্ত রোডম্যাপ সিইসি কোথা থেকে ধার করে আনলেন তা বাংলার জনগণ জানতে চায়? একটি দলের প্রতি এত বেশী অভিভাবক সুলভ আচরণ এবং অপর একটি দল ও দলের জোটবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে সিইসির মাথাব্যাথার নেপথ্যে কোন রহস্য আছে তা উদঘাটন এখন সময়ের দাবী। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না সিইসি'র খুটির জোর ভিনদেশী বন্ধুর হাতে নাকি কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে তার ব্যাখ্যা যাই হোক, এদেশের জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান কারো জন্য অতীতে সুবিধাজনক হয়নি। সুতরাং আমরা আশা করছি দেরিতে হলেও সিইসি'র বোধোদয় হবে এবং দেশকে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন। নচেৎ সব ধরনের অশুভ পরিণামের ফলাফল তাকেই নিতে হবে।

নভেম্বর ২০০৮

www.amarboi.org

মহাজোট সরকারের ১০০ দিন

পাঁচ বছর মেয়াদের একটি সরকারের ১৮২৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন খুবই কম। এই সময়ে সাফল্যতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ধারণ নিতান্তই কঠিন। কিন্তু আওয়ামী মহাজোট সরকারের বেলায় তার বিপরীত, কারণ মহাজোটের মহাবিজয়ের মহাচমক দেখার জন্য মহা উদগ্রীব হয়ে দেশের আমজনতা তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে আছে। দিন বদলের যত ওয়াদা তার আলোকে ১০০ দিন অনেক সময়। কারণ প্রত্যেক দিন কয়েকটি করে ওয়াদা পূরণ না করলে তাদের অনেক ওয়াদা ১৮২৫ দিন শেষে বাকি থেকে যাবে। তাই মহাজোট সরকারের ১০০ দিনের পর্যালোচনা গোটা সময়ের তুলনায় নিতান্তই কম হলেও সুবিধার দিক হলো এর জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন হবে না। আওয়ামী লীগকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে, তারা প্রতিদিন অনেক কর্ম সম্পাদন করছে। কিন্তু দেখার বিষয় সেগুলো সুকর্ম না অপকর্ম। ডিজিটাল কায়দায় দিন বদলের শ্লোগান দিয়ে আসা মহাজোট সরকারের চমকপ্রদ শ্লোগান অনেকটাই বারাক ওবামা সরকারের বঙ্গানুবাদ হলেও এর কারিশমা আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারিনি, এটাই আফসোসের বিষয়। আওয়ামী লীগের দিন বদলের হাওয়া ইতোমধ্যে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। আর কিছুদিনের মধ্যে সর্বত্রই পৌঁছে যাবে। এই অর্থে বে-রশিকরা বলেন আওয়ামী লীগ বলে যা, করে তার বিপরীত এটাই আওয়ামী লীগের কর্ম মাপার মানদণ্ড।

আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া ওয়াদা যথার্থ বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে অশান্তির কালো বাতাস চতুরদিকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে শিক্ষাঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন, সংসদ, সেনানিবাস, মিডিয়া, কল-কারখানা, গার্মেন্টস সেক্টর, মসজিদ-মাদ্রাসা ও নিজ দলের অভ্যন্তরে আগুন লাগাতে সক্ষম হয়েছে। বাকিগুলোতে উত্তেজনা ছড়াতে ও দিন বদলাতে উদগ্রিব মন্ত্রী এবং এমপিরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের আশা ছিল আওয়ামী লীগের কিছু নতুন মুখ এবং তাদের বিরাট দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে দায়িত্বশীলপূর্ণ ভূমিকা পালনে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু না, এই ধারণাকে তারা ভুল প্রমানিত করেছেন নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। কারণ কেউ না জানলেও আওয়ামী লীগ জানে এই দায়িত্ব জনগণের দেয়া নয়, দেশের মানুষ তাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনেনি। বরং যারা তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করাই আওয়ামী লীগের ঈমানী দায়িত্ব। আর জনগণের কল্যাণে কিছু করার অর্থ বেঈমানী বা বিশ্বাসঘাতকতা। এই হিসাব কষেই আওয়ামী লীগ অগ্রসর হচ্ছে। তাই আওয়ামী

www.amarboi.org

লীগের কাছে জনগণের কোন কল্যাণ প্রত্যাশাও দুরূহ। যতটুকু পাওয়া যায় তাও করুনা ছাড়া কিছুই নয়।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে দাবি করেছেন, ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার কারণেই নাকি আওয়ামী লীগের এই অবিশ্বাস্য বিজয় সম্ভব হয়েছে। মহাজোট সাথী জেনারেল (অবঃ) হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলেছেন, যেহেতু এক-এগারো না হলে আওয়ামী লীগ কোনো দিনই ক্ষমতায় আসতে পারত না, কাজেই ওই বিশেষ দিনের কুশলবীদের প্রতি আওয়ামী লীগের সব সদস্যের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে "শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দলীয়করণ ও সেশনজটমুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা, বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে বলা আছে"। আরো উল্লেখ আছে–

"ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণী ও দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সুদৃঢ় ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই উপরোক্ত কর্মসূচি ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব"। আওয়ামী লীগ যে ১০০ দিনে তার বিপরীতটাই করেছে, এটি বিচারের দায়িত্ব দেশবাসীর উপরই রইল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে বিজ্ঞান চর্চার কথা বললেও চর্চা করছে অস্ত্রের। সরকারের একশ' দিনে সরকারকে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে দেয় দলের অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রলীগ।

একের পর এক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্রলীগের বিবাদমান গ্রুপের সংঘর্ষে সরকারকে বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সারাদেশে কয়েকশ'রও বেশি ছোট-বড় সহিংস ঘটনা ঘটেছে। একই সঙ্গে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসে খুন হয়েছে নিজ সংগঠনসহ বিরোধী সংগঠনের একাধিক ছাত্রনেতা। প্রকাশ্য দিবালোকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে রাবি শিবির সেক্রেটারি শরীফুজ্জামান নোমানীকে এবং চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে হত্যা করে জামালপুরের হাফেজ রমজান আলীকে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড জাহেলী হিংস্রতাকেও হার মানায়।

আওয়ামী লীগের পুরনো ইতিহাস এ নতুন প্রজন্ম জানলে হয়তো আঁতকে উঠবে, যা লিখলে লেখার কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে পাঠকের বিরক্তি চলে আসতে পারে। তারপরেও বিদেশী সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস এর এলিগ্যাসি অব ব্লাড বই এর কিছু অংশ উল্লেখ না করে পারলাম না। তিনি তার বইয়ের ৪৩ পৃষ্ঠায়

www.amarboi.org

লিখেছেন "১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতার দ্বিতীয় বছর। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালান আর রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ, রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। মুজিব তার রক্ষীবাহিনী আর সশস্ত্র কর্মীদের দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। পক্ষে বিপক্ষে চতুর্দিকে কেবল অস্ত্র আর অস্ত্রের ঝন্-ঝনানী। সাধারণ মানুষের মাঝে করুণ নিরাপত্তাহীনতা। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর তখন যশোর ব্রিগেড কমান্ডার। তার মতে, সে প্রায় ৩৩ হাজার অস্ত্র এবং প্রায় ৩৮ লাখ গোলা তার অধীনস্থ ৬টি জেলা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে কেবল রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ২,০০০ অতিক্রম করে।

শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল ছিল অত্যন্ত বদমেজাজী। বাবার মতো সেও বাংলাদেশকে তার ব্যক্তিগত সম্পতি বলে মনে করতো। তার পরিবার বা দলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচারণকে কামাল রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে মনে করতো। শেখ মুজিব হয়তো তার ছেলের কিছুকিছু কাণ্ডকীর্তি পছন্দ করতেন না- কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে বাংলার আকাশে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।"

"১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সাল। রাত গভীর হয়ে আসছে। শেখ কামাল তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে সিরাজ সিকদারের খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছে। হাতে তাদের স্টেনগান আর রাইফেল। ঢাকা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ সুপার মাহবুবের অধীনে একই কাজের জন্য উপর থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিল। কামাল তা জানতো না। শিকার খোঁজার পালায় পথিমধ্যে দু'দল সামনা-সামনি হয়ে গেল। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এসে একদল অন্য দলের উপড় চড়াও হলো। গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে শেখ কামালের গলায় গুলি বিদ্ধ হলো। পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনার শেখ মুজিবকে ঘটনা অবহিত করলে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন - 'তাকে মরতে দাও'। শেখ মুজিব তারপরও দু'দিন পর্যন্ত তাঁর ছেলে কামালকে হাসপাতালে দেখতে যাননি।

তাই দেশের সকল পত্রপত্রিকা ও মিডিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যতই সমালোচনা করেন, ছাত্রলীগ ততই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আর ছাত্রলীগ বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী দুঃখ এবং ক্ষোভে সাংগঠনিক নেত্রীর পদ ছেড়ে দেন। প্রধানমন্ত্রী সাংগঠনিক পদ ছেড়ে মহাভুল করেছেন এবং তাতে তার নেতৃত্বের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়েছে আবারও। কারণ সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে বিগত দিনে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্বের একটি বড় অংশ তার উপরই বর্তায়।

www.amarboi.org

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের অযোগ্যতার যে কাজটি সবচেয়ে জঘন্য হয়েছে তা হলো মহান জাতীয় সংসদের সমাপনী অধিবেশনে দাঁড়িয়ে যখন বলেন, "সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ছেলেরা ছাত্রলীগে নাম লিখিয়ে এরকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।" একথাটি বলে তিনি নিজের দলের উপর অবিচার করেছেন। তিনি তার দায়িত্বের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে পারেননি। দেশবাসী মনে করেছেন নেত্রীর যখন এত মাথা গরম, তাহলে তো নেত্রীর সোনার ছেলেরা কমই করছেন। উল্লেখ্য কোন অবিভাবক তার সন্তানকে ত্যাজ্য করলে সে যে আরো অসভ্য হয়, ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিক্ষাঙ্গনে এবার ছাত্রলীগের অভিনব কায়দার সন্ত্রাস ছিল টাকার বিনিময়ে ছাত্রদের ক্লাস করতে দেয়া। বিরোধী সংগঠনের ছাত্রদের কম্পিউটার,বইপত্রসহ অন্যান্য মালামাল হল গেটে নোটিশ টাঙ্গিয়ে টেন্ডার দিয়ে তা বিক্রি করা। অধ্যক্ষের রুম দখল করে টাকার বিনিময়ে ভর্তি বাণিজ্য ও শতাধিক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা। এমন কি একজন সম্মানিত শিক্ষককে গাছের সাথে বেধে প্রহার করার ঘটনাও দেখলাম আমরা এই সভ্য সুশীল সমাজে। সংবাদে শুনেছি ৭২, ৯৬-এ পরীক্ষার হলে নকলের এমন আকার ধারণ করেছিল যে, মাইক দিয়ে বলে দেয়া হতো এখন এত নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখুন। আর বর্তমানে ছাত্রলীগ আবার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হুমকি প্রদান করে নকলের সুযোগ করে দিতে বাধ্য করছে। অথচ বিগত ২০০১ এর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নকলমুক্ত ছিল যা দেশবাসী পুরোপুরি অবহিত।

মহাজোট সরকারের শুরুতেই জাতীয় মহাশোক বা মহাবিপর্যয় ঘটে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে। বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। দেশকে করদরাজ্যে পরিণত করার প্রথম ধাপ ছিল এই হত্যাকাণ্ড। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়ে সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দেশের সীমান্তকে অরক্ষীত রেখে যারা লাভবান হতে চায় তাদের দ্বিতীয় অপারেশনটি হল জঙ্গিবাদের জিগির তোলা। সেনাবাহিনীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বিদেশী প্রভুদের দাওয়াত দেয়া আর বিদেশের শান্তিমিশনে সেনাবাহিনীর যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের একঘরে করে ফেলা। বাণিজ্যমন্ত্রীকে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ধামাচাপার এজেন্ডা বাস্তবায়নের উদ্যোগ এখন চাপের মুখে কিছুটা ভাটা পড়েছে। পিলখানার ঘটনায় সরকারের একজন মন্ত্রী ও একজন হুইপের জড়িত থাকার বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীর গ্রেফতারে যখন প্রায় নিশ্চিত তখন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে আওয়ামী লীগ।

www.amarboi.org

ফলশ্রুতিতে সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে সিআইডির তলব দিয়ে মোড় ঘোরানোর প্রচেষ্টা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক কিনা এই পুরাতন ইস্যু নিয়েও মাঠ গরম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় সরকার। সর্বশেষ বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সংসদের ঐতিহাসিক বক্তব্যে আওয়ামী লীগ আরো দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখনি সরকার বেছে নেয় হিংসা, বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার পথ। বেগম খালেদা জিয়ার বাড়ির লিজ বাতিলের সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অঙ্গন গরম করে পিলখানার ইস্যু আড়াল করতে সক্ষম হয়েছে। লাভ-লোকসানের হিসাবে দেশবাসী খালেদা জিয়ার বাড়ির বিষয়ে ছি! ছি! করলেও আওয়ামী লীগ আপাতত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা থেকে ফুসরত পাচ্ছে। পাশাপাশি তদন্ত কাজ যত দীর্ঘ হবে মধ্যে অনেক রাজনৈতিক ইস্যু বাজারে চলে আসবে। কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে পিলখানার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা। এখন দু-একটা গানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রত্যক্ষ করলেও এটিও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে কোন অজানা শক্তির ইঙ্গিতে।

দৈনন্দিন বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্ভোগে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিদ্যুৎ ও পানির জন্য রাস্তায় নেমে পড়েছে আমজনতা। কিন্তু সরকারের মন্ত্রীরা এটিকে জনগণের নিতান্তই অবাধ্যতা মনে করছেন এবং হুংকার তুলে বলছেন "বিদ্যুৎ ও পানি নিয়ে কোন আন্দোলন সহ্য করা হবে না"। এ যেন আরেক নব্য বাকশালের গন্ধ!

একশ' দিনে সরকারকে বেশ কিছুটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা। এ মন্দার আঁচড় বাংলাদেশেও লাগছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা ফিরে আসা শুরু করেছেন। রফতানি খাতেও মন্দার প্রভাব পড়েছে। জঙ্গিবাদ খুঁজতে এবং প্রভুদের কাছে কৃত ওয়াদা দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে সরকারকে আবিষ্কার করতে হবে জঙ্গিবাদ। ফলে যত্রতত্রই জঙ্গি খোজা শুরু করেছে সরকার। আর এতে সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হন এফবিসিসিআই, সকল রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান। তারা সরকারকে পরামর্শ দেন সবখানেই জঙ্গি না খোঁজার জন্য। হায়রে কপাল! অন্যের নাক কেটে যাত্রা করা আর কাকে বলে। জিহাদী বই পাওয়া গেছে বলে জঙ্গি সন্দেহে যেখানে সেখানে দাড়ি, টুপিওয়ালাদের গ্রেফতার। কুরআনে অসংখ্য জিহাদের আয়াত আছে, তাহলে কি যার কাছেই কুরআন থাকবে তাকেই জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করবেন আমাদের এই সরকার? আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন ধর্মীয় জঙ্গিবাদকে নাকচ করে একে

www.amarboi.org

সন্ত্রাসীদের কাজ বলছেন, তখন আমাদের সরকার এটাকে উস্কে রাখার ভিন্ন কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনরা।

বিশিষ্ট কলামিস্ট মাহমুদুর রহমান লিখেছেন, "১০০ দিনের মধ্যে প্রশাসনের খোলনচ বদলে ফেলার লক্ষ্যে রেকর্ড পরিমাণ সরকারি কর্মকর্তাদের ও.এস.ডি, বদলি, এমনকি কর্মচ্যুতও করা হয়েছে। এই গত সপ্তাহতেও ২৩ জেলার ডিসিকে একসাথে পরিবর্তন করেছে মহাজোট সরকার।"

সরকারের কট্টর সমর্থক পত্রিকা সমকাল পর্যন্ত ৭ এপ্রিল ডিএমপির অর্ধেক থানার ওসি গোপালগঞ্জের শিরোনামে নিম্নোক্ত সংবাদ ছাপাতে বাধ্য হয়েছে : "ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ৩৫ থানার মধ্যে ১৭টির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাড়ি গোপালগঞ্জে! এর ফলে প্রশাসনে এক প্রকার ভারসাম্যহীনতা ও অবিশ্বাস এবং বদলী ভীতি তৈরি হয়েছে।"

জোট সরকারকে ধ্বংস করেছে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতো কিছু গণ্ডমূর্খ অশিক্ষিত মন্ত্রীরা আর মহাজোটকে ডুবাবে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য মন্ত্রীরা। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাফার স্টেট না বুঝা এবং সৌদী থেকে ফিরে ৭ বছর বাংলাদেশের কোন সরকার প্রধান সৌদী বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করেননি' এমন মিথ্যা তথ্য দেয়া, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের- 'কওমী মাদ্রাসা জঙ্গিবাদের প্রজনন কেন্দ্র', সব মিলিয়ে মিডিয়ামন্ত্রী ফারুক খানের- বিডিআর হত্যাকাণ্ডে জঙ্গিরা জড়িত', প্রেস ব্রিফিং বিজ্ঞ প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ এবার আওয়ামী লীগের ঘরে বাইরে একসাথে আগুন লাগিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত জুনিয়র নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের পর এ নিয়ে সব মহলেই প্রশ্ন ওঠে। আওয়ামী লীগের মালিক পক্ষ (তোফায়েল, আমু, রাজ্জাক, সুরঞ্জিত, জলিল) এবার ক্ষমতার বাইরে। আর ক্ষমতাবঞ্চিত জলিলতো আক্রোশের বশে বোমা ফাটালেন। ফলে অনভিজ্ঞ নেতাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দিনবদলের সংগ্রাম কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন সে শঙ্কা এখনও দূর হয়নি।

এপ্রিল ২০০৯

www.amarboi.org

ছাত্ররাজনীতির এ কোন হিংস্রতা

২০০৯ সালের মাত্র কিছুদিন আমরা অতিক্রম করেছি। ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দফতরে ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়। এ জাতির সবচেয়ে মেধাবী, চৌকস ও বীর সন্তানদের হারিয়ে জাতি যখন শোকে ম্যূহমান, বিচারের দাবিতে সোচ্চার যখন পুরো জাতি, ঘটনার সংশ্লিষ্টতায় যখন আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড সভাপতি গ্রেফতার, ঠিক সে সময়ে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্যই পরিকল্পিত উপায়ে রাবি'র ঘটনা ঘটানো হলো। শোকাহত সেনা পরিবার যখন চোখের পানিতে ভাসমান, ঠিক তার অল্প সময়ের মধ্যে শহীদি মিছিলে শামিল হলেন আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ রমজান আলী ও শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী। পিলখানার ঘটনায় খুনিদের বিচারের দাবিতে আমরা যখন একের পর এক কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি, তখনই কফিন কাধে নিতে হল শহীদ রমজান আলী ও শরীফুজ্জামান নোমানীর মত মর্দে মুজাহিদদের।

৯ মার্চ ঠিক পড়ন্ত বিকালে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় আমাদের প্রিয় ভাই হাফেজ রমজান আলীকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্যাতনের পর নির্যাতন করে মারাত্মকভাবে তাকে আহত করে। পাষণ্ড নরপশুরা নির্দয়ভাবে আহত করেই ক্ষান্ত হয়নি, মুমূর্ষু মানুষটিকে চলন্ত ট্রেনের নিচে ফেলে দেয়। ফলে শরীর থেকে তার পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ যেন আইয়ামে জাহেলিয়াতের বর্বরতাকেও হার মানায়। হাসপাতালে নিতেই শাহাদাত বরণ করেন জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের মেধাবী সন্তান হাফেজ রমজান আলী। হাফেজ রমজান ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। দাখিলে A^+ পেয়ে আলিমে পড়ছিলেন, আশা ছিল সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে পরিবার আর সমাজের জন্য কাজ করবেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে কুরআনের দাওয়াত দিতে গিয়েই প্রাণ দিতে হল কুরআনের হাফেজ প্রিয় ভাই রমজানকে। তার মৃত্যুতে শুধু পরিবারেরই ক্ষতি হয়নি; জাতি হারিয়েছে মেধাবী, সৎ ও বলিষ্ট নেতৃত্ব। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হাফেজ রমজানকে অপহরণ করার কিছুক্ষণ পূর্বে জীবনের শেষবারের মতো কথা বলার একটা সুযোগ তারা দিয়েছিলো। প্রিয় ভাই রমজান পাশের ফোনের দোকান থেকে শেষ কথাও বলেছেন। কিন্তু নিজের কাছে টাকা না থাকায় বলেছিলেন, 'ফোনের বিল আমার থানা সেক্রেটারি পরিশোধ করবে।' জীবনের শেষ মহূর্তেও হাফেজ রমজান সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। এখন প্রশ্ন জাগে, কি অপরাধ ছিল হাফেজ রমজান আলীর?

www.amarboi.org

শহীদ নোমানী সম্পর্কে আমাকে কিছু লিখতে হবে। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই অপারগতা প্রকাশ করতাম, কিন্তু দায়িত্ব আমাকে বাধ্য করেছে লিখতে। তার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু কথা ও স্মৃতি প্রতিটি মুহূর্তেই আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সে স্মৃতি স্মরণে নিজের অজান্তেই চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দায়িত্ব আমাকে সেই সুযোগটি দেয়না বলে একান্তে তার জন্য চোখের পানি ফেলেছি আর মহান প্রভুকে বলেছি, 'আল্লাহ! তুমি আমার এই প্রিয় ভাইকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দাও।' আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলাম বিধায় সেখানকার অনেক ঘটনা, আনন্দ-বেদনা মিশে আছে আমার জীবনে। কিন্তু তা আজ শুধুই স্মৃতি। শহীদের সংস্পর্শের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আজ আমি গর্বিত, কারণ আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দার খুব কাছাকাছি থাকার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

এই মুহূর্তে শহীদ নোমানীর সাথে প্রথম সাক্ষাতের কথা খুব করে মনে পড়ছে। দিন-ক্ষণ মনে নেই, এসএম হলের সামনে তার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। হাস্যোজ্জ্বল, মায়াবী চেহারার সুঠাম দেহের অধিকারী নোমানীকে প্রথম দেখাতেই নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন মনে হয়েছে। জানলাম, তিনি কর্মী। বললেন, 'কাম্পাসে এসে দাওয়াত পেয়েছি।' আচরণে ও কথায় নম্র ও বিনয়ী নোমানীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'দ্রুত সাথী হয়ে যান।' এর কিছু দিন পরেই সাথী শপথ নিতে আসলেন তিনি। কন্টাক্ট করে বুঝলাম তার মেধার গভীরতা। শপথের পর তাকে দ্রুত সদস্য হতে বললাম। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এই ভাইটি অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এবং অল্প সময়েই সদস্য হলেন তিনি। প্রথমে এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়। সবাই তার চাল-চলনে, আচার-আচরণে, মেধা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ। তার সুন্দর বক্তব্য, অপূর্ব সুন্দর তেলাওয়াত তাকে সবার প্রিয় মানুষে পরিণত করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলেন। এতো অল্প সময়ে এতদূর অগ্রসর হয়ে দায়িত্ব পালনের নজিরও করেছেন শহীদ নোমানী । আমি তাকে কোনদিন রাগান্বিত, বিরক্ত হতে দেখিনি। সদা নিশ্চুপ, কিন্তু ছিলেন অবিচল।

ঘটনার আগের দিন রাত থেকে শুরু করে শাহাদাতের কয়েক মিনিট পূর্ব পর্যন্ত অনেকবার কথা হয়েছে তার সাথে। কিন্তু তিনি ছিলেন ধীর স্থির, প্রতিটি সময়ে তিনি আমাদের সাহস যুগিয়েছেন। রাত থেকে হলে তল্লাসী, ফজর থেকে শুরু করে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি; দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা জিম্মি করে নির্যাতন করার ঘটনা পিলখানার সেই ভয়াল জিম্মিদশা ও সেনা হত্যারই যেন আর এক অধ্যায়। এই পাশবিকতা শুধুমাত্র নরপশু হিংস্র হায়েনাদের পক্ষেই সম্ভব। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা স্তব্ধ গোটা ক্যাম্পাস। সেদিন যেন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একযোগে লাশের খেলায় মত্ত। সব জায়গায় কথা বলে যখন নিরুপায়, তখন

www.amarboi.org

আমাদের করণীয় শেষ করলাম– কখনো ফোনে, কখনো জায়নামাযে। পরিষদের ভাইয়েরা একসাথে বসে সবাই মিলে মহান রবের দরবারে হাত তুলে বললাম, 'পরওয়ারদিগার! আমাদের যেখানে শেষ, তোমার সেখানে শুরু।' চিৎকার করে তাঁর কাছে ফরিয়াদ করলাম, ' আয় আল্লাহ, এই ভাইদের জীবন তোমার কাছেই সোপর্দ করলাম। তুমি আমাদের পরীক্ষা সহজ কর। প্রভু গো, শহীদের রক্তে কেনা এই জমিন থেকে আমাদের বিতাড়িত করোনা!' সেই কান্নার আওয়াজ এখনো কানে ভাসে। অতঃপর বিজয়ী হলাম ঠিকই তবে মূল্য দিতে হলো অনেক চড়া।

নোমানী ভাইয়ের কাছে যতবারই জানতে চেয়েছি কি খবর, তিনি বলেছেন কোন অসুবিধা নেই। এই তো ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সেদিন গোটা ক্যাম্পাসে সবাইকে মুক্ত করতে নোমানী ভাইয়ের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সর্বশেষ তিনি যখন জানতে পারলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে আটকরত সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৯ জনকে হত্যা করতে যাচ্ছে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা, তখনি আল্লাহর পথের অকুতোভয় সৈনিক নিজের জীবনের বিনিময়ে ভাইদের উদ্ধার করেন। তখন পুলিশ ও র‍্যাব-এর সহায়তায় ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা শিবির কর্মীদের উপর হামলা করে। পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ এবং রক্তলোলুপ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র হামলায় আমাদের অনেক ভাই আহত হন। উন্মাদের মত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা নোমানী ভাইয়ের মাথায় ধারালো রামদা দিয়ে উপর্যুপরি কোপ দিলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা খুনের নেশায় এমনই উন্মত্ত হয়েছিল যে শহীদ নোমানীর মৃত্যু নিশ্চিত জানার পরও তারা রামদা দিয়ে তার বাম হাতের আঙুল কেটে ফেলে এবং মাথায় কুপিয়ে আঘাত করে মাথার মগজ বের করে ফেলে। বয়ে যায় রক্তের স্রোতধারা। যে মাথা ছিল মহাগ্রন্থ আল কুরআনের, তা তখন দ্বিখণ্ডিত; যে কপাল আল্লাহকে সিজদা করতো, তা তখন রক্তাক্ত; যে হাতের ইশারায় মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকতেন, সে হাতের আঙুল তখন হাত থেকে বিচ্ছিন্ন। মুহূর্তে লাল হয়ে গেল মতিহারের সবুজ চত্তর। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে যান কর্মচঞ্চল প্রিয় ভাই নোমানী। নিথর হয়ে যায় বলিষ্ট নেতৃত্বের সাহসী মানুষটির সুঠাম দেহ। বীরবেশে পান করেন শাহাদাতের অমিয় সুধা। আমাদের বুক ভাসিয়ে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান প্রিয় ভাই শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

কয়েক মিনিট পরেই খবর এলো গোটা ক্যাম্পাস শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু শহীদ নোমানীর শাহাদাতের খবরে ততক্ষণে তার পিতা ও মাতা বাকরুদ্ধ। সন্তানহারা পিতার নির্বাক জিজ্ঞাসা আর বৃদ্ধা মায়ের করুণ রোনাজারির প্রশ্নের কি জবাব

www.amarboi.org

দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন? সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠকে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে নোমানীকে হত্যার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এড়াবেন কিভাবে?

মাত্র একমাস পর যে ভাইটি মাস্টার্স পরীক্ষার সার্টিফিকেট নিয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে যেতেন, আজ তিনি শুধুই স্মৃতি। কি বলে সান্ত্বনা দেবো তার আবক্ষা আম্মাকে? সদা হাস্যোজ্জ্বল নোমানী শুধু মেধাবী ছাত্রই ছিলেন না, সাধারণ ছাত্রদের কল্যাণে কত না ভূমিকা রেখেছেন তিনি। এমনকি দেশের কল্যাণেও বহু ভূমিকা রেখেছেন। তার মাঝে ছিল বাংলাদেশকে গড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ছিল দীপ্ত শপথ। তিনি ছিলেন শিল্পী ও লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্নেহভাজন ছাত্র, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীর প্রিয় বন্ধু। সেদিন যখন আমেরিকা, লন্ডন, মক্কা শরীফসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন করে সবাই খোঁজখবর নিচ্ছে, শহীদদের জন্য সর্বত্র দোয়া চলছে, তখন মনে হচ্ছিল যে, আমাদের শহীদেরা কতো বেশি ধন্য ও মর্যাদাবান! আমরা হয়তো হারিয়ে যাবো কিন্তু তারা অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল। শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী আজ একটি ইতিহাস।

আমরা আমাদের প্রিয় সাথী নোমানী ও রমজানকে ফিরে পাবোনা। আমরা এভাবে ১৩৩ জন সাথী-ভাইকে হারিয়েছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়? আর কত মায়ের বুক খালি হবে? আর কত ভাই-বোনের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হবে? আর কত দিন হত্যা, সন্ত্রাস, লুণ্ঠন চালিয়ে যাবে ছাত্রলীগের মানুষরূপী নরপশুরা। সত্য-মিথ্যার চিরন্তন আদর্শিক দ্বন্দ্বের সাহসী সৈনিক নোমানী ও রমজান বিশ্বাস আর নির্মাণে ছিলেন অকুতোভয়। দীপ্ত পথচলা আর আল্লাহভীতি ঘিরেই তাদের জীবন। আজ তারা আল্লাহর মেহমান, তারা সবকিছুর উর্ধ্বে। কিন্তু আমরা জানি, শহীদ নোমানী ও রমজানের শাহাদাত এ আন্দোলনকে পিছিয়ে দেয়নি বরং এগিয়ে নিয়েছে বহু দূর। এ সীমানা পরিমাপ আমাদের সাধ্যের বাইরে। আর আমাদের দায়িত্বের পরিধিও বেড়ে গেল অনেক দূর। সে সীমানাও অজানা। যারা শহীদ নোমানী ও রমজানদের ভালোবাসেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শোককে শক্তিতে পরিণত করে এ কাফেলাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া। এতেই তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

শহীদ নোমানী ভাইয়ের মা আজ বাকরুদ্ধ। তিনি বলেন– 'আহ্! আমার এতো আদরের বাবাকে তারা কিভাবে কুপিয়ে হত্যা করলো? আমি যদি সেখানে থাকতাম, তাহলে বলতাম, তোমরা আমাকে কোপ দাও কিন্তু আমার কলিজার টুকরো নোমানীকে আঘাত করো না।' শহীদের বাবা জনাব হাবিবুল্লাহ নিজেই সন্তানের জানাযা পড়ান। তিনি জানাযার পূর্বে বলেন, 'হে আল্লাহ, আমি তো তোমার কাছে চেয়েছিলাম আমার ছেলে আমার জানাযা পড়াবে, কিন্তু আমি আজ ছেলের

www.amarboi.org

জানাযা পড়াচ্ছি। আর কাঁধে বহন করছি তার কফিন। মাবুদ গো, তুমি শুধু আমার ছেলেকে শহীদ হিসেবে কবুল করো। কি অপরাধ ছিল আমার সন্তানের? আমি তোমার কাছেই এই হত্যার বিচার চাই।' ছোট ভাতিজা-ভাতিজী কিছুই বুঝেনা, তারা বাকরুদ্ধ। ছোট দুই শিশুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার ভাষা আর খুঁজে পেলাম না। তাদেরকে আদর করার প্রিয় চাচ্চু আর নেই। 'কেন মারা হল তাদের প্রিয় চাচ্চুকে?' এই হল তাদের জিজ্ঞাসা।

প্রিয় ভাইদের হারিয়ে আজ আমরা শোকাহত। তার বৃদ্ধ বাবা-মা আর পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে হারানোর বেদনায় জ্বলতে থাকবেন প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত। মহান রবের দরবারে সন্তানহারা মায়ের আহাজারি আর প্রতিরাতে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষে চোখের পানি কি কোনই কাজে আসবেনা? আসবে, অবশ্যই আসবে। একদিন তারা পাবেন এই রোনাজারির পুরস্কার। আল্লাহর সম্মানিত অতিথি হবেন শহীদের পিতা মাতা হিসেবে। সেদিন জান্নাতের সবুজ পাখি হয়ে উড়তে থাকবেন শহীদেরা। এটাই তো শহীদের চূড়ান্ত সফলতা! ন্যায় ও বাতিলের এই দ্বন্দ্ব কোন সাময়িক বিষয় নয়, এটি চিরস্থায়ী আদর্শিক দ্বন্দ্বেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবের সিঁড়ি, কর্মীদের প্রেরণার বাতিঘর, উজ্জীবনী শক্তি, নতুন করে পথচলার সাহস। আর খুনীরা হয় ক্ষতিগ্রস্ত, ভীত ও সন্ত্রস্ত। তবে ওরা থেমে থাকেনা। চালিয়ে যায় একের পর এক মানুষ হত্যা। কেননা, ওদের সত্তা কলুষিত। তবে আমাদের বিশ্বাস এই দুনিয়ার আদালতে এর নায্য বিচার না হলেও আল্লাহর আদালত থেকে খুনিরা রেহাই পাবে না। শাহাদাত মুমিন জীবনের বাসনা। বাতিলের ধক্ষজাধারীরা হয়তো শহীদ রমজান ও নোমানীকে হত্যা করে আন্দোলন পিছিয়ে দিতে চায় কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে হত্যা, জেল যুলুম চালিয়ে কোন আদর্শিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না। শহীদ নোমানী ও রমজানের মত সন্তানদের হারিয়ে তার পরিবারকে কষ্টের পাহাড় বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন। সংগঠন তাদের নেতৃত্বের শূন্যতা অনুভব করবে অনেকদিন। কিন্তু তাদের রক্তের যোজনায় জন্ম নিবে আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় অগনিত সৈনিক।

মার্চ ২০০৯

www.amarboi.org

প্রসঙ্গ ছাত্ররাজনীতি : সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই

টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডে আগুনে পুড়ে গেছে আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ। হয়ে গেল অপূরণীয় ক্ষতি। প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে বাংলাদেশ। বিচার দাবি করেছে এর মূল হোতা নাইকোসহ সংশ্লিষ্টদের। ক্ষতিপূরণ নেয়া হচ্ছে তাদের নিকট থেকে। তদন্ত কমিটি করা হয়েছে আসল বিষয় ক্ষতিয়ে দেখার। এত আয়োজন এই ক্ষতিতে । কিন্তু আমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতীয় মানবসম্পদ ছাত্র তথা যুবসমাজ। যারা দেশ ও জাতির মুকুট। আবার এই ছাত্র-যুবকরাই ছাত্ররাজনীতির সাথে জড়িত। এখান থেকে তৈরি হবে আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্য নেতৃত্ব। এটিকে আমরা যদি একটি খনির সাথে তুলনা করি, তাহলে বলতে হয়, এই খনির আহরিত সম্পদই আমাদের শ্রেষ্ঠ পুঁজি। কিন্তু এই খনি আগুনে জ্বলছে বছরের পর বছর। নিভছে না, বরং প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে দিনের পর দিন। এই জ্বলে পুড়ে যাওয়া তরুণ-যুবক মেধাবী মুখগুলোকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে কি কেউ? সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা কর্তৃক ছিনতাইয়ের ঘটনা বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতির নোংরা ও কলুষিত চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। এক সময়কার সেই আহঙ্কার, আজকের লজ্জা। মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বের নন্দিত ছাত্ররাজনীতি আজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিন্দিত ও কলুষিত। ছাত্রনেতা নাম শুনলেই আজ মানুষ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অথচ এক সময়ে যারা ছাত্ররাজনীতি করত তাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চোখে দেখত। তখনকার ছাত্রনেতারা ছিলেন যোগ্য, ভদ্র, নম্র, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা নিয়মিত ক্লাস করতেন। ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্ররাই ছাত্রনেতা হতেন। ভালো রেজাল্টধারী, মেধাবী ছাত্ররাই ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতেন। তাদের উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী শক্তি দেখে মুগ্ধ হতো সবাই। তাদের শাণিত বক্তব্য দেশ গড়ার কাজে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করত। দেশ ও জাতির সঙ্কট মুহূর্তে এই আদর্শ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে আপামর ছাত্রজনতা যেকোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকত। এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররা। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৯০'র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু আজকের ছাত্ররাজনীতি সকলের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, সিট দখল, হল দখল ও অস্ত্রবাজির আর এক নাম আজকের ছাত্ররাজনীতি। ছাত্রনেতা মানেই যেন ভয়ঙ্কর কোনো সন্ত্রাসী। টাকার জন্য হেন

www.amarboi.org

কাজ নেই তারা করতে পারে না। ছাত্র ও আদুভাই মার্কা নেতৃত্বে পরিচালিত আজকের ছাত্ররাজনীতি আমাদের ভবিষ্যতকে করে তুলেছে মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু কেন? কেন এই অবস্থা? মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্ররাজনীতির দৃশ্য এ রকম হলো কেন? দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এবং আমাদের ভবিষ্যতকে রক্ষার জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে পেতে হবে এর সুষ্ঠু সমাধান।

আমাদের বর্তমান এই ছাত্ররাজনীতির দশার পেছনে প্রথম যে কারণটি সক্রিয় তা হলো আমাদের জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার লোভ। আসলে আমাদের জাতীয় নেতাদের চরিত্রের অধঃপতনের সমান্তরালে ছাত্রনেতাদের চারিত্রিক স্খলন ঘটেছে। আমাদের জাতীয় নেতারা ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করছে ছাত্রদের। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও টাকা তুলে দিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলা করার জন্য মাঠে নামানো হচ্ছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা কথায় কথায় বলেই ফেলেন অমুককে মোকাবেলা করার জন্য অমুক সংগঠনই যথেষ্ট। লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয় ছাত্রদের। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা হচ্ছে মেধাশূন্য ও পেশাদার সন্ত্রাসী। মাদকদ্রব্য ও নারী আসক্ত করিয়ে লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশের অনেক এমপি-মন্ত্রীরা মদের আড্ডায় মিলিত হন ছাত্রদের নিয়ে। এভাবে আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ছাত্রদের ব্যবহার করছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে মারামারি, রক্তপাত ও হানাহানি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিরোধীদল সব সময় তার ছাত্রসংগঠনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিতে চায়। বিগত এক বছরে ঢাবি বন্ধ ছিল ২৬৫ দিন। কয়েক বছরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অধিকাংশ অরাজনৈতিক ইস্যুকে রাজনৈতিক মোড়ক পরানো হয়েছে। এবং প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কিছু দিন পূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতে ছাত্রী হলে দুই যুবক প্রবেশ করার কল্পিত নাটক সাজিয়ে আন্দোলনের নামে ভাঙচুর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড় কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি সাধন করে বামসংগঠনগুলো। সম্পতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যাপী হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধর্মঘট তারই হীন দৃষ্টান্ত। বিরোধী ছাত্রসংগঠন চায় সরকারে ব্যর্থতা প্রমাণ করতে। আর অন্যদিকে সরকারিদলের ছাত্রসংগঠন চায় সরকারিভাবে প্রভাব খাটিয়ে ক্যাম্পাসে অবৈধ টাকা উপার্জন ও শক্তি প্রদর্শনের

www.amarboi.org

মাধ্যমে আধিপত্ত বিরাজ করতে। ফলে ক্যাম্পাসগুলোতে শুরু হয় এক অসুস্থ রাজনৈতিক কালচার। সরকারি ও বিরোধী উভয় ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাস ও দৌরাত্ম্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনো অশান্ত হয়, কখনো হয় বন্ধ। পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, সেশনজট বাড়তে থাকে। মেধাবী ছাত্ররা হতাশ হয়ে পরিণত হয় ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারে। লেখাপড়া করতে এসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যায় সন্ত্রাসী হয়ে। দেশের প্রতি দেশের জনগণ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের কোনো রকম সহানুভূতি নেই। আমাদের জাতীয় নেতারা তাদের সন্তানকে লেখাপড়া করার জন্য দেশের বাইরে পাঠান। সেখানে সন্ত্রাস বা কোনো সেশনজট নেই। আবার দেশে আছে আকাশচুম্বী ব্যয়ী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেও তাদের জন্য রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অর্থে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই কার সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে সাবেক ও বর্তমান ৩ জন রাষ্ট্রপতি, ৩৫ জন মন্ত্রী, ৭১ জন সংসদ সদস্যের সন্তান দেশের বাইরে লেখাপড়া করে।

সুতরাং নিজেদের সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়ে আমাদের নেতারা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত । বাংলাদেশে অধিকাংশ কলেজ ও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এখন আমাদের জাতীয় নেতাদের অনুসারী ছাত্রনামধারী কিছু সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। আর এই তথাকথিত ছাত্রনেতারা ছাত্ররাজনীতির অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে ছাত্ররাজনীতিকেই সবার কাছে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে। বর্তমান ছাত্ররাজনীতির এই হালের পেছনে আর একটি কারণ বিদ্যমান। আর তা হলো বিদেশী ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশ যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে, বাংলাদেশের ছাত্ররা যাতে মেধাবী হিসেবে গড়ে উঠে দেশের কল্যাণ করতে না পারে তার জন্য বিদেশী কিছু ষড়যন্ত্রও আমাদের দেশে কাজ করছে। বাংলাদেশে সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকলে এ দেশের মেধাবীরা দেশের বাইরে লেখাপড়া করতে যাবে। আর মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে সেই মেধাকে তারা নাগরিক সুবিধা দিয়ে নিজেদের দেশে রেখে দেবে। একদিকে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য ও অশান্ত রাখাও হলো অন্যদিকে নিজেদের দেশে মেধাবী ছাত্রকে আমদানি করাও হলো।

আমাদের জাতীয় নেতাদের অসততা, স্বার্থপরতা ও ক্ষমতার উচ্চাভিলাষের কাঁচামাল হিসেবে ছাত্রদের ব্যবহারের প্রবণতা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অশান্ত করেছে। বাড়িয়ে তুলেছে সেশনজট, ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়েছে কলুষিত, মেধাশূন্য, সন্ত্রাস ও পেশীশক্তিনির্ভর। বিশেষ করে ভিন্ন মত এবং ভিন্ন রাজনৈতিক

www.amarboi.org

আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণুতার অভাব ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে হানাহানি, হল দখল ও আধিপত্ত বিস্তারের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। আর বিদেশী চক্রান্তের জালতো আছেই। কথায় কথায় ছাত্র ধর্মঘটের আহক্ষানও সেই অসুস্থ রাজনৈতিক কালচারের বহিঃপ্রকাশ।

অথচ ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে হামলার পর আমেরিকাতে কোনো হরতাল বা ধর্মঘট হয়নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়নি। ইরাক হামলার বিরুদ্ধে নিউইয়র্কে ১৫ আগস্ট ২০০২ পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। লন্ডনে ৭ লক্ষ লোক ইরাকে হামলার জন্য ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। কিন্তু তারা ভাঙচুরনৈরাজ্য, হরতাল বা ধর্মঘট করেননি। কারণ তাদের মধ্যে দেশপ্রেম আছে। তারা দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। আমাদের দেশের নেতারা কথায় কথায় হরতাল ও ছাত্রধর্মঘট ডেকে দেশকে ধক্ষংসের দিকে নিয়ে যেতে কার্পণ্য করে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এ অবস্থা থেকে কি কোনো মুক্তি নেই? এভাবে কি চলবে বাংলাদেশ? অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি, সন্ত্রাস আর সেশনজটে জর্জরিত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কি কোনো উপায় নেই? প্লেটো বলেছেন, Man is by born a political being. মানুষ জন্মগতভাবেই একটি রাজনৈতিক সত্তা। জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও কথাটি সত্যি। তাই মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত কেউ না কেউ ক্ষমতাধর হয়ে উঠেন। সিদ্ধান্ত তার কাছ থেকেই আসে। শারীরিক শক্তি, মানসিক যোগ্যতা, মানবিক দক্ষতা সব কিছুর বিবেচনায় কেউ না কেউ প্রমিন্যান্ট হয়ে ওঠেন। ক্রমেই এই প্রমিন্যান্ট ব্যক্তিই হয়ে ওঠেন ডমিন্যান্ট। মেধায়, যোগ্যতায়, সেবায় ডমিন্যান্ট হলেই একজনকে সবাই মেনে নেয়। তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হয়। নিরাপত্তা, সেবা ও সাহায্য আশা করে। এই নেতৃত্বের উপরই নির্ভর জনশক্তির কল্যাণ-অকল্যাণ। এই নেতৃত্ব যদি সৎ হয় তাহলে তার নেতৃত্বে সমাজে শান্তি আসে আর নেতৃত্ব অসৎ হলে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের জাতীয় ও ছাত্রনেতৃত্ব উভয়েরই অবস্থান সততা ও দেশপ্রেম থেকে অনেক দূরে। তাই আমাদের সমাজ ও ছাত্ররাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সৎ ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব অপরিহার্য। ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ, বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা, অসততা, দুর্নীতি পরিহার করে আমাদের জাতীয় নেতারা দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে এলেই একমাত্র ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা সম্ভব। মেধাহীন, সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতিকে দেশের জনগণ, ছাত্রছাত্রী কেউই পছন্দ করে না। মেধাবৃত্তিক আদর্শিক

www.amarboi.org

ছাত্ররাজনীতি তাই আজ সময়ের দাবি। সকল দলাদলি রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে আমাদের জাতীয় নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে আজকের মেধাবী, সৎ ও আদর্শনির্ভর ছাত্ররাজনীতি উপহার দিতে। লেজুড়ভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি নয় বরং ছাত্রসংগঠনগুলোকে স্বাধীন করে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের মেধা বিকাশ এবং গঠনমূলক ও ইতিবাচক কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছাত্ররাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা থাকতে পারে। জাতীয়ভাবে তারা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে না। কিন্তু সরাসরি রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ছাত্রসংগঠনগুলোকে ব্যবহারের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। আর ছাত্রসমাজকেও সন্ত্রাস ও মেধাহীন ছাত্রনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে মেধাবী, চরিত্রবান ও আদর্শিক ছাত্রনেতৃত্বের ধারা তৈরি করতে হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে, মানুষ গড়ার আঙিনা থেকে যাতে সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা যায় এজন্য দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কিন্তু এই উদ্যোগ নিবে কে?

আমি মনে করি উন্নতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান শপথ গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং ঐতিহাসিক উদ্যোগও তাকে নিতে হবে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে এগুলোর বিরুদ্ধে অভিযানের সাথে সাথে প্রয়োজন সৎ ও যোগ্য লোক গড়ে তোলা। আর সত্যিকার মানুষ তৈরির এই কারখানাটি হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা ছাত্রসংগঠনগুলো। তাই টেংরাটিলায় আগুন নিভাতে আমরা যতটা সচেতন, যতটা উদ্যোগী, যতটা প্রতিবাদী তার কিয়দংশও যদি ছাত্রসংগঠনগুলোর ক্ষেত্রে প্রদর্শন করতাম, তাহলে এত করুণ দশা হতো না। আজকের ছাত্র মানেই আগামী দিনে দেশ পরিচালনার কর্ণধার। সুতরাং এই কর্ণধার গড়ে তোলা জাতীয় ও রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েই চলছেন। এ কথা ঠিক যে, সরকারের অনেক পজেটিভ কর্মকাণ্ড আজ তাদের দলীয় ছাত্রসংগঠনের হীন কলুষিত নোংরা কাজ ম্লান করে দিচ্ছে। তাই দেশ ও জাতীয় স্বার্থে ছাত্ররাজনীতির ব্যাপারে বিরোধীদল ও সরকার উভয়ই একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবেন এটাই জাতির প্রত্যাশা।

www.amarboi.org

নির্যাতিত ছাত্র সমাজ অপমানিত সেনাবাহিনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ও একজন সেনা সদস্যের মধ্যে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের সম্মান ও মর্যাদার সাথে আমাদের সমগ্র ছাত্রসমাজের মর্যাদা ও সম্মান জড়িত তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। এই চেতনাবোধ থেকেই আমাদের গৌরব ও অহংকারের ৫২'এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯'এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১'এর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ৯০'এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন গোটা জাতিকে বিজয়ের মালা পরিয়েছে। আর বাংলাদেশের মানুষও ছাত্রসমাজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি তাদের গর্ব ও অহংকারের ধন মনে করে আসছে। সেই অবস্থান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে কোন ছাত্রের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে দেশের সাধারণ মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক কেউই সমর্থন করেনি। বরং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর সকলে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ছাত্রসমাজের পক্ষ অবলম্বন করেছে। কারণ ছাত্রসমাজই হচ্ছে দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ। আর নিকট অতীতে ছাত্রসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সোনালি ইতিহাস।

আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দও উপরোক্ত সকল কথা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল বলেই সাথে সাথে এ ঘটনার যথাযথ এবং সম্মানজনক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ, সেনা কর্মকর্তাদের হাসপাতালে আহতদের দেখতে যাওয়া, দোষী ব্যক্তির যথোপযুক্ত বিচারের আশ্বাস আমাদের সেনাবাহিনীর বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ছাত্র শিক্ষকের দাবির মুখে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। সরকারের পক্ষ থেকেও দুঃখ প্রকাশ, ছাত্রদের প্রতি পূর্ণ সমবেদনা জ্ঞাপন, বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ইত্যাদি তড়িৎ পদক্ষেপ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিকতারই পরিচয় বহন করে। এ ঘটনা এখানে শেষ হয়ে গেলে ছাত্রসমাজের মর্যাদা আরো সমুন্নত হতো।

আমাদের সেনাবাহিনীর আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ আচরণ এবং ছাড় দেওয়ার মানসিকতা তাদের সম্মান ও মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট ঘটনার এই সমাধান ছিল গোটা জাতির কাছে আকাঙ্ক্ষিত। দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধিকারী ছাত্রসমাজ ও সেনাবাহিনীর মিলন গোটা জাতিকে আশান্বিত করতো। কে বা কারা তা হতে দিলো না। বরং ঘটনাকে পুঁজি করে গোটা দেশব্যাপী একটি অরাজক

www.amarboi.org

পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হল। সারা দেশে জ্বলে উঠলো আগুন। পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ছাত্রসমাজের সহিংস সংঘর্ষ সারা দেশকে উত্তপ্ত করে তুললো। The Daily Star পত্রিকায় একজন সেনা অফিসারকে ছাত্র কর্তৃক লাথি মারার দৃশ্যটি দেখে দারুণভাবে আহত হলো দেশবাসী। কোটি কোটি টাকার সরকারি বেসরকারি সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আহত হলো অনেক ছাত্র ও নিরীহ মানুষ। পরিণামে যা হওয়ার তাই হলো। জারি হলো কারফিউ, বন্ধ হলো বিশ্ববিদ্যালয়, হলগুলো খালি করে দেওয়া হল, জনজীবনে আবারও নেমে এলো আতঙ্ক ও স্থবিরতা। আজ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার সময় এসেছে যে, একটি ছোট্ট ঘটনাকে পুঁজি করে দেশব্যাপী একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির নেপথ্য নায়ক কারা?

এইতো সেদিনই আমরা দেখেছি, রৌমারিতে আমাদের সৈনিকদের সাথে অজপাড়াগাঁয়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে B.S.F এর ভয়াবহ হামলাকে মোকাবেলা করেছে। ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপব বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। আমাদের এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর কেউ ভেদ করতে পারেনি। নারায়ে তাকবীরের বিপরীতে ভারতের B.S.F এর বন্দুকের নল থেকে গুলিই বের হয়নি। তাই অনেকেই যেমন আমাদের এই ঐক্যকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি সহ্য করতে পারেনি ঢাবির ছাত্রসমাজ ও সেনাবাহিনীর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাধানকেও। তারা চেয়েছিল ছাত্রসমাজ ও সেনাসদস্যের মুখোমুখি অবস্থান। আমাদের দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দলের সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর দূরত্বের খবরটি কারও অজানা নেই। এই দলটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বিগত দিনেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার জন্য সেই দলের প্রধান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী গ্রেনেড হামলায় আমাদের সেনাবাহিনীর কোন একটি অংশকে দায়ী করে বক্তব্য দিয়েছেন। একজন সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান যিনি পরবর্তীতে ঐ দলটির টিকেটে এমপি প্রার্থী হন তিনি আমাদের সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অস্ত্রভাণ্ডারের হিসাব পত্রপত্রিকায় ছাপিয়ে সেনাবাহিনীকে বিতর্ক করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং ১১ই জানুয়ারির পূর্বেও দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সেনাবাহিনীর শান্তি পূর্ণ অবস্থানকে আওয়ামী চৌদ্দদল স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এটি সকলেরই জানা এভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আওয়ামী বাম রাজনীতির সাথে আমাদের সেনাবাহিনীর দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সুতরাং এটা অনুমান করতে মোটেই বেগ পেতে হয় না যে সেনাবহিনীকে ছাত্রসমাজের মুখোমুখি দাঁড় করানোর নেপথ্যশক্তি কারা!

www.amarboi.org

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও সেনাবহিনীর এই শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভবত দেশে আওয়ামী বামরা সহ্য করতে পারেনি। সহ্য করতে পারেনি তাদের প্রভু আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। তারা ঘটনার পরবর্তীতে একটি নন ইস্যুকে পুঁজি করে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসের ভয়াবহ নারকীয় তাণ্ডব চালিয়েছে। জ্বালাও-পোড়াও ভাঙচুর এর সাথে কিছু ছাত্র নামধারী যুবক ও রাজনৈতিক দলীয় ক্যাডার সম্পৃক্ত হয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে আমাদের পিতার সমতুল্য শিক্ষকগণও প্রত্যক্ষভাবে এই ধক্ষংসযজ্ঞে মদদ দিয়েছেন।

কিন্তু আমি জানি না যে, শিক্ষকরা আমাদের তারুণ্যকে উস্কিয়ে দিয়ে ধক্ষংসাত্মক কার্যকলাপে যেভাবে লিপ্ত করলেন তার পরিণাম তারা কখনো ভেবে দেখেছেন কিনা। আন্দোলনে চেতনা যোগালেন তারা। আমাদের ছাত্রসমাজের ভালবাসার পরিবর্তে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের প্রচেষ্টা কি বেশি চালাননি? তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানের পরিবর্তে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তা ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় বেশি তৎপর ছিলেন না?

তারা এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে সেনাবাহিনী ও ছাত্রসমাজকে মুখোমুখী করে রক্তক্ষয়ী অবস্থান এমনকি মানুষের জানমালের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে। কিছু মানুষকে হত্যা করে সরকারকে বিপদে ফেলার অসৎ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওই সকল প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বা গ্রেফতারকৃত শিক্ষকবৃন্দের হ্যাঁ বলা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না। যাতে অন্তর্জাতিক কমিউনিটির নিকট সরকারকে অকার্যকর, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সরকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের সেনাবহিনী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা হলো যাতে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশ যদি আমাদের সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করতে পারে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করতে পারে তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে তারাই। তাই এই সুযোগ কাজে লাগাতে ভারতের 'র' সংস্থাটি আগুনে ঘি ঢেলেছে। এর পেছনেও খরচ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কথিত আছে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকবৃন্দ অধিকাংশই আমাদের প্রতিবেশী ভারতের 'র' সংস্থাটির বেতনভুক্ত। বর্তমানে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জোটসরকারের বসানো প্রশাসন থাকার কারণে আওয়ামী বামরা এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাননি। তাছাড়া আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ সময় বন্ধ রেখে গোটা জাতিকে মেধাশূন্য করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এদিকে যেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার

www.amarboi.org

উপক্রম সৃষ্টি হয় তেমনি বিত্তশালীদের ছেলে-সন্তাননেরা উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ আমেরিকা, ইংল্যান্ড পাড়ি জমায়। এক রিপোর্টে দেখা যায়, প্রতি বছর ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে তাদের উলেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশী। এছাড়া যারা উচ্চশিক্ষা অর্জনে বিদেশে পাড়ি জমায় তাদের বিরাট একটি অংশ দেশে আর ফেরত আসে না। সে কারণে আমরা অর্থনৈতিক ও মেধা উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আজকে যারা ছাত্রসমাজকে নিজেদের ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে হীন ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করছেন তাদের ছেলে-মেয়েরা অধিকাংশ দেশের বাইরে পড়ালেখা করছে। সম্প্রতি এক রিপোর্ট দেখা যায়, বাংলাদেশের সাবেক তিনজন প্রেসিডেন্ট, প্রায় কয়েকশ' মন্ত্রী/এমপির ছেলে-সন্তানরা বিদেশে পড়ালেখা করছে। সুতরাং আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর বন্ধ থাকলেও তাদের কিছু আসে যায় না। ২০০৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২০০ দিনেরও বেশি বন্ধ ছিল।

"মাইনাস টু থিওরি" এবং রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপগুলোকে স্তব্ধ করে গণঅসন্তোষ–এর সৃষ্টি করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। লক্ষ্যণীয় যে জ্বালাও-পোড়াও, গাড়ি ভাঙার দৃশ্য অনেকটা ২৮শে অক্টোবর '০৬ স্টাইলে সংঘটিত হয়েছে। অনেক নেতৃবৃন্দই মনে করছেন এই ঘটনার মাধ্যমে সরকারের পরাজয় নিশ্চিত। তাই তারা টেলিভিশনে ফলাও করে এটিকে রাজনৈতিক সমস্যা উলেখ করে এর রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেছেন এবং নিজেদের গুরুত্ব তুলে ধরার প্রচেষ্ট চালিয়েছেন। মূলত সেই আওয়ামী বাম নেতৃবৃন্দই কি তাহলে এর আসল মদদদাতা? কিন্তু যারা একটি ঘটনাকে পুঁজি করে অসৎ উদ্দেশ্যে আমাদের ছাত্রসমাজের তরুণ্যকে উস্কে দিয়েছেন তাদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর আছে কি?

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ল অনেকগুলো সোনালি সময়। ক্ষতিগ্রস্ত হল দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ। বিঘ্নিত হলো জগণের জানমালের নিরাপত্তা। ভীতি সৃষ্টি হলো জনজীবনে। আহত হলো অসংখ্য মানুষ। লাশ হয়ে ঘরে ফিরল একজন নিরীহ রিকশা চালক। কে এখন আহার যোগাবে তার এতিম সন্তানের? কে সান্ত্বনা দেবে তার পিতা–মাতা, স্ত্রী–স্বজনদের? এর আদৌ কোন সদুত্তোর আছে কি কারো কাছে?

পাশাপাশি সরকারের জন্য এ ঘটনা একটি বড় ধরনের ম্যাসেজ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস, ঢালাও অভিযানে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, অর্থনেতিক মন্দাভাব এবং জন অসন্তোষের প্রান্তসীমায় উপনীত। এ দেশ এ ঘটনা

www.amarboi.org

যে একটি গণঅসন্তোষের আলামত তা সরকারের উপলব্ধিতে আসবে বলে মনে হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ১১ই জানুয়ারির পর জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনী। এরা যদি বিতর্কিত হয় তাহলে আমাদের আর শেষ ভরসা বলতে কিছু থাকবে না। তার খেসারত দিতে হবে গোটা জাতিকে। আর সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন কার্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিতর্কিত করার জন্য দেশী বিদেশী যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তারও মোকাবেলা করতে হবে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্কতার সাথে। তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে সফল হবো।

এদেশের ছাত্রসমাজকে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে বহুদিন থেকে । এহেন কোন খারাপ কাজ নেই যা ছাত্রদের দিয়ে করানো হয়নি। হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ভাঙচুর, হল দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এমনকি ধর্ষণের সেঞ্চুরিও আজ আমাদের কলঙ্কের তিলক। ছাত্রসমাজ এ সকল কার্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে হারিয়ে ফেলে তাদের মেধা, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ। আর এই ছাত্ররাই যখন সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বগ্রহণ করে তখন সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির এক পাহাড় গড়ে তোলে, ফলে গোটা জাতি হয়ে পড়ে বিপদগ্রস্ত। জাতি সেই সন্ধিক্ষণেরই মুখোমুখী। আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি নিজস্ব গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ফলে এক সময়ের সোনালি অতীত ছাত্ররাজনীতি এখন দারুণভাবে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত। সুতরাং আজ সময় এসেছে ছাত্রসমাজের সকল প্রকার লেজুড়বৃত্তিতা পরিহার করে নিজেদের স্বতন্ত্রবোধকে জাগ্রত করার। মেধা এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে একটি উন্নত জাতি গড়ে তুলতে হলে আজ প্রয়োজন একটি উন্নত প্রজন্ম গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত একটি নতুন প্রজন্ম। আর এর জন্য প্রয়োজন নৈতিকতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয়ে একটি শিক্ষাব্যবস্থা। দুভাগ্যজনক হলেও সত্য, স্বাধীতার ৩৬ বছর পার হলেও সে রকম একটি শিক্ষাব্যবস্থা এখনো গড়ে উঠেনি। তাই ছাত্র সমাজ দেশ ও জাতিকে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের দুর্নীতি, সন্ত্রাস নামক মহামারির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা না যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি জরুরি একটি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন যুবসমাজ গড়ে তোলা। আর ছাত্ররাই গড়ে তুলতে পারে অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত আগামী দিনের সম্ভবনাময়, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

মার্চ ২০০৫

www.amarboi.org

নব্য স্বৈরাচার জেনারেল মইন কি বিচার প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে যাবেন?

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বহুবার ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমতালিপ্সু কিছু মানুষের চরিত্র দেখেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের একদলীয় বাকশাল, হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসন ও ১/১১ পর কেয়ারটেকার সরকারের অপশাসন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। যার নির্মম খেসারত দিতে হয়েছে বাংলাদেশের জনগণকে। দেশের আপামর জনতার আন্দোলনের ফলে ৯০'র স্বৈরাচার পতনের পরবর্তী গণতান্ত্রিক অবকাঠামো মানুষকে আশান্বিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে, আর যাই হোক এদেশে আর কষনও কোন অগণতান্ত্রিক অপশক্তির উদ্ভব হবে না। কিন্তু না, শিশু গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যার নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এ চক্রের সদস্য দেশী ও বিদেশী শক্তির যৌথ উদ্যোগ। এবার শিশু গণতন্ত্রের হত্যা sound less. এুখে কাপড় ঢুকিয়ে চিৎকার বন্ধ করে ১লা জানুয়ারিতে তৎকালীন কলঙ্কিত সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদকে দিয়ে নিশ্চিত করে জাতিসংঘ নামক মৃত এ সংস্থার মাধ্যমে।

মানুষের স্বাভাবিক এবং সুন্দর স্বপ্নকে ভেঙে ভেঙে কিছু ক্ষমতালিপ্সু বিশ্বাসঘাতক যুগে যুগে সাধুবেশে কষনও বা আড়ালে ক্ষমতার মসনদে আসিনের সকল প্রস্তুতি নেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমনই এক নব্য গেস্পরগোবিন্দ জেনারেল মইন দেশের স্বশস্ত্র বাহিনীর চিরাচরিত ঐতিহ্যকে নষ্ট করে জাতির সাথে প্রতারনা করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। সেনাপ্রধান থাকাকালীন সময়ের তার কার্যাবলি আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে জেনালের মইন জাতির সাথে কত বড় বে-ঈমানি করেছেন।

জেনারেল মইন আহমেদ বাংলাদেশে বহুল আলোচিত এবং কালো অধ্যায় ১/১১'মর জনক। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে দুই বছর জরুরি শাসন নামের মানবতা বিরোধী শাসনের শিকার হতে হয়েছে। স্থাপনা ধ্বংস, দোকানপাট ধ্বংস, হকার উচ্ছেদ, দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় উর্ধ্বগতি, দেশের কর্পোরেট ব্যক্তিদের গেস্খফতার, ২ বছর ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম অস্থিরতাসহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে এই অপশাসন। এদেশের একজাতীয় পরগাছা সুশীল মইনের ফর্মূলা বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বাদে সকল স্তরের মানুষ ভোগান্তিও শিকার হয়েছে।

www.amarboi.org

মইন আহমেদ মাইনাস ফর্মূলার জনক। যার মাধ্যমে বাংলাদেশে নেতৃত্ব শূন্য করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ শক্তিকে আমন্ত্রণ জানানোর সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। কিন্তু দৈবত কারণে মইন ফাইনাল সিগনাল কোথাও থেকে না পেয়ে পরবর্তীতে দুই নেত্রীকে শর্ত সাপেক্ষে ছেড়ে দেন। কিন্তু শুধু মইনের খায়েশপূরণ করার জন্য বিনা অপরাধে দুই নেত্রীসহ দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদদের চরিত্র হরণ এবং কারাগারে বন্ধী জীবন কাটাতে হয়েছে। আদালত যদি রাজনীতিবিদদের নির্দোষ প্রমাণিত করে তবে বিনা দোষে কারাবরণ এবং চরিত্রে কালি লেপনের দায়দায়িত্ব মইন উ আহমেদকেই নিতে হবে এবং তার বিচার হতেই হবে।

জেনারেল মইন সেনাপ্রধান থাকাকালীন যে ভারত সফর তা যা আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তার আবেগকে অন্যদিকে প্রভাবিত করে, সেই সাথে একজন সেনাপ্রধানের অন্যদেশের উপঢৌকন নেওয়া দেশের একজন সরকারি বেতনভূক্ত কর্মকর্তার জন্য কতটা যৌক্তিক সে ব্যাপারে সবার প্রশ্ন রয়ে যায়।

জেনারেল মইনের পৃষ্ঠপোষকতায় ডিজিএফ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় হস্ত ক্ষেপ করে এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের ভাষ্যে ডিজিএফএর এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের কায়েকজন নেতা। জেনারেল মইন ক্ষমতায় থেকে বই লিখে বিখ্যাত হবার এক সস্তা আয়োজন করেন যা তার দুর্নীতিবাজ চরিত্রের ফলক উন্মোচন করে।

তার সময়ে জাতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি বিডিআর কর্তৃক সেনা অফিসারের নির্মম হত্যাকাণ্ড যা কষনও পূরণীয় নয়। এত বড় ঘঁনায় মইনের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে তাকে রিমান্ডে নেয়া জাতীয় দাবি।

রাজনীতিবিদদের নিয়ে মন্তব্য এবং জাতির জনক প্রসঙ্গে তার বিবৃতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে জেনারেল মইন ১/১১এর আয়োজনে এশটি দলকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। জেনারেল মইন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানের (যিনি স্বীকৃত দুর্নীতিবাজ) উপহার গন্ধহণ করেন । পরবর্তীতে সংবাদপত্রে তোপের মুখে জেনালের মইন পদত্যাগ করেন বাফুফে থেকে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার ভাইয়ের প্রার্থীতা এবং সেখানে সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিতর্কিত, যা মইন আহমেদের অগণতান্ত্রিক মানসিকতার সাক্ষ বহনে যথেষ্ট। তাকে আইনের আওতায় আনলে বস্তাবন্দী হাজারো কু-কীর্তির এক এক করে বেরিয়ে আসবে ।

এয়াড়া জেনালের মইনের কু-কীর্তি অনেক রয়েছে যা নিয়ে অনেক আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছে। একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক মইন আহমেদকে মোনাফেক

www.amarboi.org

হিসেবে সমকাঔলীন টিভি চ্যানেলের এক টকশোতে উল্লেখ করেন। আসাফ-উদ-দৌলা মইনকে লাইনচ্যুত ট্রেনের চালক হিসেবে উল্লেখ করেন। যার বিচারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, তার নিজের জেলাসহ সারাদেশের মানুষেরা মিছিল মিটিং করছে। সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ বলেছেন সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসতে পারত না। এবং সেই সাথে বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হাসিনা সরকার, সারাদেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, ছাত্র, রাজনৈতিক দল সবাই যখন জেনারেল মইনের বিচার দাবি করেছে তখন সরকার কুখ্যাত মইনকে পুরস্কৃত করতে চাচ্ছে। সুতরাং দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে জেনালের মইনের কার্যক্রম প্রমাণিত করে তিনি একজন দুর্নীতিবাজ সেনাপ্রধান এবং সেই সাথে তার দুর্নীতি থেকে মুক্তি পেতেই বর্তমান আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে এশটি সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে। আমাদের দুর্ভাগ্য জাতীয় কোন ব্যাপারেই আমরা একমত হতে পারি না। বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় না যেত, তাহলে তারা কি জেনারেল মইন গংদের বিচারদাবিতে আমাদের মত সোচ্চার থাকতেন না?

ইতিহাস সাক্ষী, যারা বে-ঈমানদারদের সাথে আপোষ করে জনগণ তাদের সাথে আপোষ করেনা।ঔ মীরজাফররা বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে বটে, কিন্ত ইতিহাস মীরজাফরদের ক্ষমা করেনি। সুতরাং যদি জেনারেল মইনকে তার কু-কর্ম থেকে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ পুরস্কৃত করে জনগণ নিশ্চয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করবে না অথবা আওয়ামী লীগে যোগদানই মইন ইউ আহমেদের শেষ নয়। জেনারেল মইন গংদের বিচার হলে ভবিষ্যতে ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে বাংলাদেশ রক্ষা পাবে এ প্রত্যাশা সবার।

আগস্ট ২০০৯

www.amarboi.org

গণতন্ত্র ও সাম্প্রতিক ভাবনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উত্তম শাসন ব্যবস্থা। গোটা বিশ্ব আজ গণতন্ত্রের জয়গানে মুখরিত। প্রাচীন গ্রীক নগররাষ্ট্র থেকে শুরু করে আজকের যুগের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার বিকাশ লাভ করেছে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক শাসনের বিকল্প আজ আর কিছু নেই। অ্যারিস্টটল যদিও গণতন্ত্রকে সবচাইতে মন্দ সরকার মনে করেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায় থেকে আমরা পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করেছি- প্রথম পর্যায়টি ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে বেসামরিক শাসন থাকলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যক্তিগতকরণ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক গণতন্ত্র চর্চা হয়নি বললেই চলে। নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চর্চা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল যা সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের শাসনকাল। তবে ৭৫-৮২ সময়কাল ছিল (ক) পুরো সামরিক (খ) একটি সামরিক সরকারের বেসামরিক ব্যবস্থায় রূপান্তরের চেষ্টা।

তৃতীয় পর্যায় ১৯৮২-৯০ ছিল পুরোপুরি সামরিক শাসনকাল। এই সময়কালে কখনই প্রকৃতভাবে বেসামরিক শাসনে উত্তরণের চেষ্টা করা হয়নি।

চতুর্থ পর্যায় রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের পর থেকে বেসামরিক শাসন। এখানে জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদের শাসনামলের পার্থক্য হচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমান একটি সামরিক সরকার থেকে নিজেকে একটি আধা-সামরিক ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন।

পঞ্চম পর্যায়- শেখ হসিনা ও খালেদা জিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার। বলা যায় একাট জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবাবে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর অবারিত সম্ভাবনা যখন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ঠিক সেই সময়ে দেশীয় কতিপয় পত্র-পত্রিকা, তথাকথিত সুশীল ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফসল আজকের এই বিপর্যয়। এখান থেকে আজ অবদি চলছে সেনাসমর্থিত নিরুদ্দেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

এ কথা সত্য যে, দেশ পরিচালনার জন্য সৎ, ন্যায়বান, সুবিবেচক ও কর্তব্যনিষ্ঠ নেতা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক শাসনে এসব অত্যাবশ্যক। কিন্তু দেশে আদর্শ নেতৃত্বের সংকট পরিলক্ষিত হলে শাসনকার্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আদর্শবিচ্যুত নেতৃত্বের কারণে একনায়ক ক্ষমতা দখলের জন্য এগিয়ে আসে। ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট বলেছেন, "এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একনায়কতন্ত্র শক্তিশালী ও সফল সরকার হিসেবে জন্মলাভ করতে পারে না" (History proves that dictotarships do not grow out of strong and successful governments)। সরকার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলেই স্বৈরশাসন ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়।

www.amarboi.org

অধ্যাপক লিংকন স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রে ভাগ করেছেন। সরকার যখন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং জনকল্যাণকর কাজ করে তখন তাকে গণতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। কিন্তু যখন সমগ্র জনসাধারণের কথা না ভেবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থের জন্য দেশ শাসন এবং জনমতকে উপেক্ষা করে তখন স্বৈরতন্ত্র বলা হয়। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই লেবাস পরেই এগিয়ে চলছে।

সি এফ স্ট্রং বলেন, "গণতন্ত্র সেই সরকার যেখানে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা আইনগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে অর্পিত না থেকে সমাজের সকল সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকে" (....that form of government in which ruling power of a state is legally vested not in any particular class or classes but in the members of the community as a whole)।

গ্যাটিসবার্গে প্রদত্ত পূর্ণ বক্তব্য হল, "That this nation, under God, shall have a new birth of freedom; and that the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth"। শাসনক্ষমতায় যাবার একটিই মাত্র পথ হল জনগণের রায়। জনগণের রায়ে শাসনক্ষমতায় গিয়ে শাসক নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন করতে পারে না। Voting is an important part of the democratic process.

In political theory, *democracy* describes a small number of related forms of government and also a political philosophy. A common feature of democracy as currently understood and practiced is competitive elections. Competitive elections are usually seen to require freedom of speech, freedom of the press, and some degree of rule of law. Civilian control of the military is often seen as necessary to prevent military dictatorship and interference with political affairs. In some countries, democracy is based on the philosophical principle of equal rights."Majority rule" is a major principle of democracy, though many democratic systems do not adhere to this strictly—representative democracy is more common than direct democracy, and minority rights are often protected from what is sometimes called "the tyranny of the majority". Popular sovereignty is common but not a universal motivating philosophy for establishing a democracy.

www.amarboi.org

সব সময়ে জনগণের ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন করবে এবং তার দ্বারা যে কল্যাণ হবে তা সব সময়েই জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনে মত প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গণতন্ত্র যতই সুন্দর হোক না কেন তা সবার জন্য একই রকম কল্যাণ বয়ে আনতে পারে কি? এর উত্তর পেতে আমরা যদি স্বাধীনতার ৩৭ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব-

গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন একনায়কতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিউম্যানের মতে, "একজন বা কতিপয় ব্যক্তি যখন দেশের সকল প্রকার শাসন ক্ষমতা অধিকার এবং তা প্রতিরোধহীন ব্যবহার করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়।" কোন বিশেষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সমর নায়ক জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল ও তা অপ্রতিরোধ্যভাবে পরিচালনা করলে তখন তাকে একনায়কতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। এটি শুধু ব্যক্তির শাসন নয়-দলেরও শাসন, তাই বিশেষ কোন দলের একনায়কতান্ত্রিক শাসনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সরকার স্বেচ্ছাচারী এবং জনমতের কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। সরকারের মূল ভিত্তি জনমত বা জনগণের রায় নয়-শক্তিই একমাত্র উৎস। সরকার কারও কাছে দায়ী নয়। অ-দায়িত্বশীল সরকারের নামান্তর একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা। একনায়কের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, অন্য কোন ইচ্ছা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। বাছাইকৃত কিছু ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে শাসন পরিচালিত হয় । এটি একদেশ, একনেতা এবং এক দলে (One state, one leader and one party) বিশ্বাসী। বিরোধীদলের কার্যপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন সময়ে বিরোধী বা প্রতিবাদী দলের উদ্ভব হলে অঙ্কুরেই তা বিনষ্টের ব্যবস্থা করা হয়। একটি মাত্র দল থাকবে এবং দলীয় কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব একনায়কের ইচ্ছা ও আদর্শ প্রচার করা। শাসনকার্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না।

ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু তিন শ্রেনিতে ভাগ করেছেন যথা; প্রজাতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রকে তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। সে হিসেবে তার শ্রেণীবিভাগ দাঁড়ায় চারটি- রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র । (১) সমগ্র জনগণ যখন শাসন প্রক্রিয়ার অংশীদার হয় তখন তাকে বলা হয় গণতন্ত্র। তাদের প্রতিনিধিগণ যখন শাসনক্ষমতা পরিচালনা করেন তখন বলা অভিজাততন্ত্র। (২) একজনের হাতে ক্ষমতা থাকলে তা হয় রাজতন্ত্র এবং (৩) ঐ একজনের শাসন যখন স্বীয় খেয়াল-খুশিতে পরিচালিত হয় তখন তাকে বলা হয় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রধান কথা হচ্ছে ভীতি। ভয় দেখিয়ে শাসন করাই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রধান নীতি।

গণতন্ত্র একমাত্র শাসন যেখানে সকলের আলোচনার সুবিধা আছে। আলোচনায় সব নির্ধারণ করা হয়। রাফায়েলের কথায়, An essential feature of democratic government is that it is a government through discussion.

www.amarboi.org

শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক বজায় থাকে। শাসক সব সময়ে মনে করে যে, তার ক্ষমতার ভিত্তি জনগণ। জনগণও ভাবে যে, সরকার তাদের নিজের। অতএব একে মান্য করা কর্তব্য। অধ্যাপক হকিং বলেন, "গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি করে শিরার সংযোগ রক্ষা করে এবং তাতে কেন্দ্রের সাথে তার যোগাযোগ রক্ষিত হয়ে থাকে"।

(Democracy as an ideal is a society of equals in the sense that each is an integral and irreplaceable part of the whole)। আদর্শ হিসেবে কোন মানুষকে তার জন্ম এবং বিত্তশালীতার মাপকাঠিতে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে না। উলফ বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হল মুক্ত, সমমর্যাদাবান, সক্রিয় ও বুদ্ধিমান নাগরিকদের সমাজ, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজেদের পছন্দানুযায়ী জীবন বেছে নেয় এবং অন্যদেরকে স্ব স্ব পথ গ্রহণে বাধা দেয় না" (A democratic society is a society of free, equal, active and intelligent citizens, each man choosing his own way of life for himself and willing that other should choose theirs)। মানবিক মূল্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। জন্ম, গোত্র, বর্ণ ইত্যাদির কোন বিভেদ করা যায় না। সমাজের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ভাবধারা মূর্ত হয়ে ওঠে- এটাই গণতন্ত্রের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। বেন্থামের মতে, "শাসক ও শাসিতের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে জনসাধারণের সার্বিক মঙ্গল সাধনের সমস্যাই হল সুশাসনের প্রধান সমস্যা। শাসিতকে শাসকের পদে উন্নীত করা সম্ভব হলে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এটা সম্ভব। তাই জে.এস. মিল বলেন, "এটা আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। গণনিয়ন্ত্রণ ও মূলদায়িত্ব গণতন্ত্রকে অন্যবিধ সরকারের চেয়ে বেশি দক্ষতার সাথে কাজ করার নিশ্চয়তা দেয়।

হেভীওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী ১৯৬০ সালে জাপানে সোনার মেডেল পান। কিন্তু এক হোটেলে অনুপ্রবেশ করতে না দেবার কারণে তা তিনি নদীতে ফেলে দেন। কারণ ঐ হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ট্রেনের বগী থেকে ১৮৯৭ সালে মহাত্মা গান্ধীকে নামিয়ে দেয়া হয়, কারণ সেটা শ্বেতাঙ্গদের জন্য বরাদ্দ ছিল (সংবাদ-২৮/৮/৯৭)। দক্ষিণ আফ্রিকার রেস্তোরাঁয় কিছুদিন আগেও লেখা থাকত 'কুকুর ও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ'। ড. মার্টিন লুথার এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যাত্রীকে নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হতে হয়। ঐ বাসযাত্রীর দোষ ছিল যে, তিনি এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর ছেড়ে যাওয়া আসনে বসেছিলেন।

অবাধ মত প্রকাশের অধিকারের স্বীকৃতি থাকে। জনগণ ইচ্ছাগত সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রদান করতে পারে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল জনমত, তাই জনগণের মত প্রকাশের অধিকার থাকতে হবে।

www.amarboi.org

গণতান্ত্রিক শাসনে মত প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকবে তাইতো প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিএফ স্ট্রং যথার্থই বলেছেন, "গণতন্ত্র সেই সরকার যেখানে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা আইনগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের হাতে না থেকে সমাজের সকল সদস্যের উপর ন্যস্ত থাকবে। এটা শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি নয় একটি সমাজ ব্যবস্থাও বটে।"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল গঠন, মতপ্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত থাকে। জনগণ প্রয়োজনে দল গঠন এবং যে কোন দলের সমর্থক হতে পারে। রাষ্ট্রে বিরোধী দল অবশ্যই থাকবে। বিরোধী দলের অস্তিত্বকে মেনে না নিলে তা গণতান্ত্রিক শাসন হতে পারেনা। কোন দলের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অস্তিত্বকে বিপন্ন করা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির পরিপন্থী। অথচ সংস্কারের নামে রাজনৈতিক দলগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হচ্ছে বর্তমান সময়ে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শীতা যেমনি আজকের দুর্ভাগ্যের লিখন, তেমনি এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও অগ্রগতি টিকে থাকা না থাকার সাথে আমাদের রাজনীতিবিদ ও দেশের জনগণের অসম্ভব রকমের ত্যাগ-কুরবানি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আমাদের দেশের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে যতটুকু স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছে, অন্য কারো সাথে তা রাজি হননি। একথাও বর্তমান ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের খেয়াল রাখতে হবে, মাইনাস টু ফর্মুলা আজ অনেকটাই অকার্যকর হতে চলেছে। সংস্কার এখন কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে। এছাড়া বিএনপি'র দ্বিধাবিভক্তি ইসি ও সরকারের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ এখন অনেকটাই ব্যর্থ। এদিকে সংস্কারপন্থী অংশের চেয়ারম্যান সাইফুর রহমানও নিজেকে পদ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সংস্কারপন্থীদের মাঝিবিহীন তরীতে ভাসালেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, অবশেষে সরকার রাজনীতিবিদদের রাজনীতির কাছে পরাস্ত হতে চলেছে।

জনগণ ইচ্ছামত সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি জনমত। তাই মতপ্রকাশের অবাধ অধিকার থাকতে হবে। ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার বলেছেন, "তোমার মতামতের সাথে আমি একমত নাও হতে পারি কিন্তু তোমার মতামত প্রকাশের অধিকার আমি জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।"

এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেন, "জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত তাদেরকে শাসন করার অধিকার কারো নাই।" জনগণের রায় যেহেতু ক্ষমতার মূলভিত্তি তাই গণতন্ত্রে সরকার স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না। জনসাধারণের মতের বা

www.amarboi.org

স্বার্থের বিপক্ষে কাজ করলে সরকার শাসনক্ষমতায় থাকতে পারবেনা। আবার সরকার স্বৈরাচারী হলে জনগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে উৎখাত করতে পারে। প্রয়োজনে জনগণ বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে।

বিশিষ্ট কলামিস্ট ফরহাদ মজহার লিখেছেন- এই সরকারের কাছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি অনেকটা 'শেয়ালের কাছে মুরগী ছানা' চাওয়ার মতো। এই অসম্ভব দাবি ত্যাগ করে আন্দোলনে মনোনিবেশ করতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্ম দিতে হলে আন্দোলনকে মোটা দাগের এই পদক্ষেপগুলো অতিক্রম করে যেতে হবে। গণতন্ত্রের মূলকথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তার সার্বভৌম ইচ্ছার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি। এই ইচ্ছাকে অস্ত্রের জোরে বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে কেউ যদি দাবিয়ে রাখে তাহলে সেই নিপীড়নকে প্রয়োজনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করার অধিকারকে স্বীকার করাটাও গণতন্ত্র। আমার অধিকার যদি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কেউ হরণ করে নেয় তবে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করাটাকে নৈরাজ্য বলা যায় না। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকারকে অপসারণের জন্য জনগণ যখন সংগঠিত হয়ে ওঠে এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ প্রভৃতি আন্দোলনকারী সংস্থার মাধ্যমে যখন জনগনের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হতে থাকে, তখন একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উদ্ভবের সম্ভাবনাও ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করতে পারে। সেটা নির্ভর করে আন্দোলনের সংস্থাগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে কিনা এবং একটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনের একটি নেতৃত্বদানকারী সংস্থা গড়ে তুলতে পারে কিনা তার উপর। আন্দোলনকে বিকশিত করার এই পদক্ষেপগুলো মোটেও নৈরাজ্যমুলক নয় কিংবা অনিয়মতান্ত্রিকও নয়।

উল্লেখ্য যে আমাদের দেশের সামরিক শাসন যতবারই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তা বৈদেশিক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই সম্পন্ন হয়েছে। গণতন্ত্রের যে সুফল তা এর প্রবক্তারাই আমাদের ভোগ করতে দেয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল সুশীল সমাজের ভাড়া করা লোকদের দালালি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। তাইতো আজ ড. কামালের মত ব্যক্তিরাই বলতে দ্বিধা করেন না "দেশ গোল্লায় যাক"। এসব সুযোগ সন্ধানী মীরজাফরদের জাতি প্রত্যক্ষ করেছে অনেকবার কিন্তু মনে রাখেনি।

দিন যতই যাচ্ছে টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্রের লাগাম ধরে রাখার অভিযোগও ততই স্পষ্ট হচ্ছে। খবর প্রকাশ ও পরিবেশনে ব্যাপক খবরদারি। এমন কি যায়যায়দিন ও আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদকের পদত্যাগও একটি শক্তিশালী মহলের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই সম্পন্ন

www.amarboi.org

হয়েছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে দেশের জনগণ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বিস্ফোরণমুখর। আর গণঅভ্যুদয়ে রূপ নেয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায়না।

১/১১-এর পূর্বে কুটনীতিবিদদের গ্রামের প্রবাদের মত "চোরকে বলছে চুরি কর আর গৃহস্থকে বলছে সজাগ থাক" অনুযায়ী দুই পার্টিকে মোটিভেশন চালিয়েছিল।

ঠিক তেমনি বর্তমান সময়েও সেই নীতিই অবলম্বন করছে ফলে সেনাবাহিনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দীর্ঘায়িত হচ্ছে। জনগণ ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি করার ষড়যন্ত্র করছে। আর এই সুযোগে অনভিজ্ঞ সরকার থেকে ভারত ট্র্যানজিট, বন্দর ইত্যাদিসহ নানা সুবিধা নেয়ার ফায়দা লুটছে।

আমরা মনে করি আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী দেশের এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে জনগণের পাশে এসে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যেভাবে দাঁড়িয়েছে তেমনি কতিপয় ব্যক্তির অদুরদর্শীতা ও ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হওয়াকে উপেক্ষা করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করে দেশপ্রেমের নজির স্থাপন করবেন।

কথায় বলে "যার ছেলেকে কুমিরে খায় সে ঢেকি দেখলে ভয় পায়"। অতীতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা চাই এবার সেই ভুলের অবসান ঘটিয়ে আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনী সেই আস্থা অর্জন করুক। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আলাপ আলোচনায় সুবিধা বিদ্যমান থাকে। আলোচনায় সব নির্ধারণ করা হয়। রাফায়েলের কথায়, An essential feature of democratic government is that it is a government through discussion. শাসক ও শাসিতের মাঝে আলোচনা সুসম্পর্ক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আমরা মনে করছি রাজনৈতিক দলের সাথে অর্থবহ সংলাপের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ বেরিয়ে আসবে।

আইনের শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে A. V. Dicy (এ. ভি. ডাইসী) তিনটি কথা বলেছেন। তাহলো : ১। সেখানে কোন স্বৈরাচারী ক্ষমতা থাকবে না (Absence of arbitrary power), ২। আইনের চোখে সমতা (Equality before law) এবং ৩। নাগরিক অধিকার (Citizens right) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আইনের শাসনের বাস্তব প্রতিফলন অপরিহার্য। থিওডোর পার্কার বলেন, চিন্তা করার, কথা বলার, কাজের এবং উপাসনা করার স্বাধীনতা থাকবে এ হবে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ। একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে দেশের সামরিক বাহিনীর ভূমিকাও কম গুরূত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনী কারণে বিনা কারণে বেসামরিক ক্ষমতার উপর হস্ত ক্ষেপ করতে এগিয়ে আসে। এ ধরনের প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি।

www.amarboi.org

গণতান্ত্রিক শাসনকে ব্যর্থ করার জন্য অনেক সময় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। এজন্য সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে। সামরিক বাহিনী কোন সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। মাওসেতুং বলেছেন, "বন্দুক কোন সময়ে দলকে নিয়ন্ত্রণ করবে না বরং দলই বন্দুককে নিয়ন্ত্রণ করবে।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে আমাদের বাংলাদেশে তা উল্টো রূপ নিয়েছে। এস.ই ফাইনার বলেন, "এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সামরিক বাহিনী বেসামরিক সরকারের অধীনে থাকবে। সেনাবাহিনীর শাসনক্ষমতায় হস্তক্ষেপ বর্তমানে অনুন্নত দেশসমূহে এত সহজাত হয়েছে যে, তারাই যেন গণতন্ত্রের প্রতি বেশি হুমকি। তাই সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা আবশ্যক।"

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই কখনও সামরিক শাসন এসেছে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে। কখনও বা থেকে থেকে সামরিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছে এসব দেশের জনগণ। ১৯৬৬ সালে সামরিক সরকার ছিল বিশ্বের ১৯ ভাগ দেশে। যা ১৯৭৩ সালে এসে দাঁড়ায় ২৭ ভাগে এবং ১৯৭৪ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২৯ ভাগে। জাতিসংঘের অর্ধেক সদস্য রাষ্ট্র কোন না কোন সময়ে সামরিক শাসনভুক্ত ছিল।

রুথ লেগার সিভার্ডের গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৮৮তে গড়ে ১৯ বছরের শাসনকাল সমৃদ্ধ ৬৪টি সামরিক সরকার ছিল তৃতীয় বিশ্বে। অপর এক হিসেবে দেখা যায়, ১৯৮৪ পর্যন্ত সমারিক শাসনভুক্ত ৬১টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশে একবার সামরিক শাসন শুরু হবার পর আর সেসব দেশে কোনদিন বেসামরিক শাসন ফিরে আসেনি। এসব দেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই শিক্ষা বা স্বাস্থ্যখাতের চেয়ে সামরিক খাতে ব্যয় অনেক বেশি।

আইউব খান, কোরিয়ার পার্ক, আনোয়ার সাদাত বা জিয়াউর রহমান কেউই কামাল আতাতুর্ক এর সামরিক থেকে বেসামরিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পদ্ধতির সঙ্গে বাস্তবে একমত হতে পারেন নি। এই সামরিক নেতারা জানতেন কিভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করা যায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়। কিন্তু বেসামরিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণে তাদের কোন পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিল না।

আইউব খান বেসামরিক ব্যবস্থায় উত্তরণের লক্ষ্যে বেসামরিক রাজনীতিক, আমলাদের সহযোগিতা নিয়েছিলেন। আবার রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করার জন্য 'মৌলিক গণতন্ত্র' চালু করেছিলেন। কিন্তু আইউব খান ব্যর্থ হয়েছিলেন বৈধতা অর্জনে এবং বৈধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন।

মিশরের জামাল আবদুল নাসের জনপ্রিয় সামরিক শাসক থাকা সত্ত্বেও একটি জনপ্রিয় এবং বৈধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একইভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন কোরিয়ার পার্ক, বার্মার নে-উইন, স্পেনের প্রিমো ডি বিভেরার মতো দীর্ঘকাল

www.amarboi.org

শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সামরিক নেতারা। কিন্তু এদের অধিকাংশ সরকার আমাদের মতো দেশে Factionalism এর মাধ্যমে গড়ে ওঠাই দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভুয়া Charismatic Leadership এর নামে বেসামরিক শাসকগণ রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকতার দিককে অস্বীকার করেন এবং একেবারেই ভুলে যান। এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলশ্রুতিতে পারিবারিক উত্তরাধিকার কিংবা রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিবারতন্ত্রের উত্থানের ফলে আজ দেশে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে। রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না থাকায় সামরিক বাহিনীর বারবার ক্ষমতা দখল বা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পথকে ত্বরান্বিত করছে। বাংলাদেশে এ প্রবণতা লক্ষণীয়।

বস্তুতপক্ষে গণতন্ত্রই আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা আদর্শ শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র অপেক্ষা কোন ব্যবস্থা যদি উন্নততর, অধিকতর উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠতর থেকেও থাকে তবে তা আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত হয়নি। এজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্থবহ ও সফল করে তুলতে হলে প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা, রাজনৈতিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। জনগণকে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং স্ব স্ব অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। তাদের অধিকার আদায় ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল অপচেষ্টার মোকাবিলায় জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে।

মে ২০০৮ইং

www.amarboi.org

জাতীয় নেতৃবৃন্দ কি বিদ্বেষের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন?

গত কয়েক দিন পত্রিকা ও মিডিয়ায় টক অব দ্য কান্ট্রি হলো বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ঐক্য। বিএনপি'র মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ঐক্যের প্রশ্নে না করবেন না, আসুন এই পরিস্থিতিতে আমরা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি। এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আশরাফুল ইসলাম তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এখন প্রশ্ন হলো বিএনপি'র মহাসচিব যে ঐক্যের আহ্বান জানালেন তা কি দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মতামত না কি খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের নিজস্ব?

আপাতদৃষ্টিতে তাকালে মনে হয় এই ঐক্যের আহবান দলীয় চেয়ারপারসনের ইঙ্গিতেই তিনি দিয়েছেন। এর কয়েকটি কারণ–

১. জাতীয় ঐক্যের আহবানের দু-একদিন আগেই আদালতে চেয়ারপারসনের সাথে মহাসচিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল

২. বেগম খালেদা জিয়া ঐ দিন আদালতের কাঠগড়ায় যে বক্তব্য রেখেছেন তা দলীয় নেত্রীর পরিবর্তে জাতীর অবিসংবাদিত ও অপোষহীন নেতার সাক্ষ্যই বহন করে।

তিনি মৃত্যু শয্যাশায়ী সন্তান কোকোকে সামনে রেখে যে বক্তব্য রেখেছেন তারমধ্য দিয়ে দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আবারো সরকারের কড়া সমালোচনা করে আপোসহীন নেত্রীর পরিচয় দিয়েছেন। দেশের নির্যাতিত মানুষ তার এই বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এখান থেকে ধারণা করা যায় তার গ্রিন সিগন্যালেই বিএনপি মহাসচিব এই জাতীয়ঐক্যের আহবান জানালেন। দেশের মানুষের মনে থাকার কথা বিএনপি চেয়ারপারসন ক্ষমতায় থাকাকালেও শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন সময় শুভেচ্ছা জানিয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

অপর দিকে জাতীয় এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে বিএনপি মহাসচিবের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জাতির সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করলেন–

১. আওয়ামী লীগ এই বিপর্যয়ের মুহূর্তেও জাতীয় ঐক্যকে প্রত্যাখ্যান করে কি 'একলা চলো' নীতির মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন? এ ব্যাপারে সম্প্রতি প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মজহার লিখেছেন– আওয়ামী লীগ যদি কোনভাবে নির্বাচন করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে তাহলে সেটাও হবে মহাভুল। অবশ্য

www.amarboi.org

আওয়ামী লীগ যদি সটকাট ওয়েতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতায় যায় তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই আওয়ামী লীগ ৮৬তে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু তাও তাদের জন্য সুখকর হয়নি।

২. যদি ক্ষমতার দিবাস্বপ্ন আওয়ামী লীগের থাকেও তা কিভাবে? সরকারের সাথে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে? না নির্বাচনের মাধ্যমে?

যদি নির্বাচনের মাধ্যমেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে যে আওয়ামী লীগ চারদলীয় জোটের সাথে মোকাবেলা করতে ১৪ দল নিয়েও সাহস পেলো না– তাদের এখনতো অনেকে নেই। তার মধ্যে এরশাদ সাহেব এখন তো অনেকটাই ক্ষমতার বারান্দায় ঘোরাফেরা করছেন। তিনি শেষ বয়সে কারাবরণের ভয়ে সরকারে সব কাজের সমর্থন জুগিয়েই চলছেন। তার অভিব্যক্তি তিনি এভাবে রাখলেন, "আমার সময়ের অসমাপ্ত কাজ এ সরকার করছে।"

তিনি ১৪ দলের জনসভায় গিয়ে বলেছেন, 'আমি মুক্ত বিহঙ্গ'। ১৪ দল ত্যাগ করে এখন কোন বিহঙ্গ?

ড. কামাল সাহেব তো বর্তমান সরকারের মহা উপদেষ্টা। এই সরকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি তিনি বললেন, 'দেশ গোল্লায় যাক, তাও আমি দুই নেত্রীকে পূজা করতে পারবো না।'

তিনি দুই নেত্রী সম্পর্কে আরও বললেন, 'যারা দুর্নীতিবাজ নেতা-নেত্রীর পক্ষে অবস্থান নেবে, দেশের জনগণ তাদেরকে প্রতিহত করবে। কিন্তু তিনি জনগণ বলতে কাদের বুঝাচ্ছেন তা দেশবাসীর বোধগম্য নয়। দেশের জনগণ জানেন নির্বাচনে যার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়, তিনি জনগণ বলতে আবার বিদেশের কাউকে বুঝাচ্ছেন কি?

তাহলে আওয়ামী লীগ কিসের ভরসায় সোনালি স্বপ্নের প্রহর গুনছে?

৩. পর্যালোচনার বিষয় হলো : আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব যে প্রত্যাখ্যান করলেন এটি কি আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্ত না তার ব্যক্তিগত মতামত?

আওয়ামী লীগে এখনও নাকি সংস্কারবাদিরা শক্তিশালী। যদিও বিএনপির সংস্কারবাদিদের অবস্থা দেখে কচ্ছপের মত মাথা গুটিয়ে নিয়েছেন। এই শক্তিই শেখ হাসিনাকে বিদেশে পাঠিয়ে ফায়দা লুটতে তৎপর। কেউ কেউ মনে করেন আশরাফুল ইসলাম জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে সরকারের এজেন্ডাই বাস্ত বায়ন করলেন। অনেকেই মনে করেন আশরাফ সাহেবকে এক অদৃশ্য শক্তি বিদেশ

www.amarboi.org

থেকে নিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগের মত একটি বড় রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক বানিয়ে রাজপথের আন্দোলন গড়ে না ওঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী সুবিধাভোগীদের সিদ্ধান্ত দলীয় নেতা-কর্মীরা কতদিন মেনে নেবে তাই দেখার বিষয়।

আওয়ামী লীগ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে নিতে পেরেছে কি?

১. ফখরুদ্দিন এর শপথ অনুষ্ঠানে উল্লসিতভাবে অংশগ্রহণ করা।

২. এই সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়া হবে বলে শেখ হাসিনার বক্তব্য। যদি বৈধতা দেয়া হয় তাহলে শেখ হাসিনাসহ সকল নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারকেও বৈধ বলা হবে কি?

৩. নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে খেলাফত মজলিসের সাথে চুক্তি করা হয়েছে। যা এতটাই নির্বুদ্ধিতা হয়েছে যে পরে আওয়ামী বুদ্ধিজীবী মহলের চাপে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

৪. এই সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল বলে আওয়ামী লীগ বক্তব্য দেয়। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে জনগণের এই দুর্ভোগ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস অবস্থা এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজ যে হুমকির মুখে তার দায় দায়িত্ব কি আওয়ামী লীগ নিতে প্রস্তুত আছে?

যাইহোক, রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। তবুও আওয়ামী লীগ বারবার শেষ কথাটি বলে দিচ্ছে। তাদের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের কারণে তারা নিম্নোক্ত সমস্যায় জড়িয়ে যাচ্ছে–

১. আগামী দিনে জাতীয় ঐক্যের সকল পথ বন্ধ করে আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে একঘরে করে ফেলছে।

২. ড. কামাল এবং এরশাদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা বক্তব্য দিয়ে নিজেদের জোটেও ফাটল ধরিয়েছে।

৩. যুদ্ধাপরাধী ইস্যুকে কেন্দ্র করে জামায়াতের সাথেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

৪. এখন বিএনপির ঐক্য প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে তাদের সাথেও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে।

জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের দলীয় মতামত বলা যায় নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে–

www.amarboi.org

১. আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মতামতটি দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের বাসায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানিয়েছেন। এ কারণে দলীয় সিদ্ধান্ত বলা যায়।

২. শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া ও মাওলানা নিজামী বর্তমানে কারাগারে কিন্তু প্রথম থেকে বিএনপি ও জামায়াত সবার মুক্তি দাবি করলেও আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র শেখ হাসিনার মুক্তিই চায়।

দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের এই সঙ্কীর্ণ অপরাজনীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। বরং আওয়ামী লীগ একটি বড় এবং পুরাতন ও অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দল হিসেবে সবার আগে এই ঘোষণা তাদের পক্ষ থেকে দেয়া প্রয়োজন ছিলো।

জাতির দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় অভিভাবকশূন্য জনগণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে জনগণ তার যথাযথ মূল্যায়ন করতো। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় গোপন কোন সুড়ঙ্গ পেয়ে যায় তাহলে ভাল কথা। আর যদি তা না হয়, দেশের জনগণের সমর্থন নিয়েই যদি ক্ষমতায় যেতে চান– তাহলে হিংসা-বিদ্বেষ আর অহঙ্কারের রাজনীতি ছাড়ুন। দেশের বিপর্যস্ত মানুষ এখন আর ১/১১ পূর্বের মত কাদা ছোড়াছুড়ি দেখতে চায় না। দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে না পারার কারণেই আজকের এই বিপর্যয়– এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। আর দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে যারা উত্তীর্ণ হতে পারবেন না দেশের জনগণ এবং দলীয় জনগণও তাদের প্রত্যাখ্যান করবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে না যদি দলীয় নেতাকর্মীদের সমর্থন না থাকে।

এর প্রমাণ বর্তমান সরকারের সকল শক্তি দিয়ে সংস্কার নামক জীবকে মৃত্যুর হাত থেকে কোরামিন দিয়েও বাঁচানো গেল না।

এই সংস্কারের সাথে দেশের জনগণ একমত হতে পারেনি। মাইনাস টু ফর্মূলা এখন সংস্কারবাদীদের জন্য শাকের করাতে পরিণত হয়েছে। ভালো দিক হলো বিএনপির সংস্কারবাদীদের জুতাপেটা করে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা আর মান্নান ভূঁইয়াদের মত হিরোদের জিরো করে বানিয়ে কারাগারে পাঠানোর দৃশ্য। আওয়ামী লীগের সংস্কারবাদীদের হুঁশ ফিরেছে এই পরিণতি দেখে তাই তারা সকল শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে এখন নেত্রীর মুক্তি চাচ্ছেন। তবুও তোফায়েল সাহেব মামলা থেকে বাঁচতে পারলেন না। আর যে ক'জন পার পাবে তা আল্লাহই ভালো জানেন।

যাক যা বলছিলাম, জাতীয় ঐক্যের আহ্বানকে খুব তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করে সৈয়দ আশরাফ উপরিউক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। পাশাপাশি এই দুর্যোগপূর্ণ

www.amarboi.org

মুহূর্তে দলীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে আওয়ামী লীগ অদূরদর্শিতা ও দলীয় সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থেকে বাকশালীয় চরিত্রের অবতারণা করলেন আর বিএনপি জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে এবং সকল নেতা-নেত্রীর মুক্তি চেয়ে উদার রাজনীতি প্রচলন করে দেশের জনগণের প্রশংসা কুড়ালো আওয়ামী লীগ যদি এই প্রস্তাবকে এই বলে মনে করে থাকে যে বিএনপি খুব বেকায়দায় আছে বিধায় ঐক্যের আহক্ষান করছে তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে।

কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। এদিকে চারদলীয় জোট আগের মতোই ঐক্যবদ্ধ।

রাজপথের নিয়ামক সবচেয়ে বড় শক্তি সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং ছাত্রশিবির দু'টি সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন চারদলীয় জোটের সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের রয়েছে মজবুত অবস্থান। তাই দেশের মানুষের প্রত্যাশা এখন আর হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বিধা বিভক্তির রাজনীতি ও দলীয় সঙ্কীর্ণতা নয় বরং এসো সবাই মিলে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করি। এই দুর্যোগে যে যত উদারতার পরিচয় দেবে আগামী দিনে জনগণ তাদের স্মরণ রাখবে। আর যদি এটি আওয়ামী মুদ্রা দোষই হয়, তাহলে জাতির কপাল আরো পুড়রে।

একটি গল্প দিয়েই শেষ করতে চাই– এক পরিবারে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় ঝগড়া হতো। এর মধ্যে স্ত্রী ছিল খুব রগচটা, একরোখা। হঠাৎ একদিন ঐ মহিলা পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। ডুবুরি এনে যথারীতি লাশ খোঁজা হচ্ছে। ডুবুরি পানির স্রোত যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে লাশ খুঁজছে। কিন্তু স্বামী যেহেতু তার স্ত্রীর একরোখা রগচটা সম্পর্কে জানত তাই সে ডুবুরিদের বলল, ভাই তোমরা আমার স্ত্রীর লাশ স্রোতের বিপরীত খোঁজ! কেননা আমার বিশ্বাস, আমার স্ত্রী জীবিত থাকতে যেমন উল্টো দিকে চলত, তেমন মৃত্যুবরণ করেও স্রোতের বিপরীতেই যাবে বলে মনে হয়। আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, এই দেশটাই যদি না থাকে তাহলে আমরা রাজনীতি করব কোথায়? রাজনীতিবিদদের বলব হিলারী-ওবামা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন।

ডিসেম্বর ২০০৭

www.amarboi.org

গোয়েবলসীয় সূত্রে জঙ্গিবাদ

গোয়েবলস বা গোয়েবলসীয় শব্দটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ পরিচিত। অধিক মিথ্যাচার করলে এ শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। মূলত গোয়েবলস জোসেফ ছিল হিটলারের অনুসারীদের অন্যতম। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। পরে বার্লিনের অন্যতম নাৎসি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মিথ্যা বারংবার কিংবা দশ বার জোর দিয়ে বলতে পারলে তা সত্যতে রূপান্তরিত হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি তার এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান প্রচারযন্ত্রকে পরিচালিত করেন এবং বার্লিনের পতনের সময় হিটলারের এই বিশ্বস্ত সহচর তার সাথেই ছিলেন। গ্রেফতার এড়াতে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। তার এই কৌশল থেকে এখনও মিথ্যাচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়। আমার উদ্দেশ্য গোয়েবলসের জীবন কাহিনী বর্ণনা করা নয়, বরং বোমা হামলা নিয়ে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর গোয়েবলসীয় চরিত্রের যে দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে তার একটি চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরা।

সম্প্রতি দেশজুড়ে যে অব্যাহত বোমা হামলা চলছে, তা নিয়ে গোটা জাতি উদ্বিগ্ন। মৃতদের মর্মবেদনায় কাতর শোকাহত স্বজনরা, নিরাপত্তাহীনতার ছো ছো উত্তেজনা প্রতিটি মুহূর্তে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে দেশের মানুষকে। এই সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশবাসীর আশা ছিল সকল রাজনৈতিক দল সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে দেশ-জাতি, গণতন্ত্র, সংবিধান, মানবতা ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এ ইস্যু অন্তত দলমত ও রাজনৈতিক এজেন্ডার ঊর্ধ্বে থাকবে এটাই প্রত্যাশা। সেই আশা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংলাপের আহবান জানালেন সকল দলকে। শুধু তাই নয় তিনি চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিক দূত পাঠালেন বিরোধী শিবিরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর চিঠি গ্রহণের সৌজন্যতাটুকুও দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রীর এই আচরণকে দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে কোন মানুষই ভাল চোখে দেখেনি। এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি মোকাবেলায় যেমনি তার ঔদার্যতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি শেখ হাসিনা চিঠি গ্রহণ না করে সঙ্কীর্ণমনের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাহলে কি শেখ হাসিনা পরিকল্পিত উপায়ে পশ্চিমাদের মত সংকট সৃষ্টি করেই যাবেন? পশ্চিমাশক্তি তাদের অপছন্দের নেতাকে যে চারটি উপায়ে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের এক নম্বর শত্রু হিসাবে তুলে ধরে, তা হলো: 1. Stage one is the cricies-সংকট

www.amarboi.org

সৃষ্টি করা, 2. Stage two is the demonisation of the enemy leader-নেতাকে দানব হিসাবে তুলে ধরা, 3. Stage three is the dehumanising of the enemy as individual- ব্যক্তিগতভাবেও শত্রু মনুষ্যত্বহীন বলে প্রচার করা, 4. Stage four is the atrocity stay- শত্রুর অত্যাচার ও নৃশংতার গল্প তৈরি করা। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ পশ্চিমা অনুকরণে সংকট সৃষ্টির সকল Stage অতিক্রম করেছে। তাইতো দেশবাসী বোমা হামলায় দুঃখ,কষ্ট ব্যথা-বেদনা সহ্য করে যতটা এগিয়ে চলছে তার চেয়ে বেশি অসহ্য ও অসহনীয় হচ্ছে রাজনৈতিক দলের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, হিংসা, বিদ্বেষ ও মিথ্যাচারের যাতাকলে পিষ্ট। কেন এই অহেতুক প্রতিযোগিতা? এই প্রতিযোগিতা কি গোয়েবলসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে? গোয়েবলস হয়তো আজ জীবিত থাকলে আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীদের নিকট নতি স্বীকার করে ওস্তাদ বলে মেনে নিত।

জঙ্গিরা ইসলাম কায়েমের নামে বোমা হামলা করে যেভাবে ঘোষণা দিয়ে এগিয়ে চলছে, তাতে বেনিফিসিয়ারী কারা? এটা একটা গভীর পর্যালোচনার বিষয়। আওয়ামী লীগের অভিযোগ এটা জোট সরকারের মদদেই হচ্ছে। আর পর্যালোচনার নিরিখে কয়েকটি প্রশ্নঃ

১. কোন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে বোমা হামলা করে নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারবে? এটা কোন বিবেকবান মানুষ কি বিশ্বাস করবে?

২. বিএনপি-জামায়াত যদি বোমাবাজি করেও তাহলে ক্ষমতা হারানোর পরই করবে। এর আগে কেন?

৩. আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা হয়েছে। তখন আওয়ামী লীগের অভিযোগ ছিল এটা বিরোধীদলের কাজ। এ হামলা চালানো হয়েছে সরকারকে ব্যর্থ করার জন্য। শুধু তাই নয় আওয়ামী লীগ একই যুক্তি সেদিন দিয়েছিল যে, কোন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে কি বোমাবাজি করতে পারে? সেই যুক্তির পালাবদলে আমরা এখন কী বলব?

৪. যারা বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে, জেএমবি আত্মপ্রকাশের কয়েকবছর পূর্ব থেকে দেশে তালেবান আছে বলে আসছে, এমনকি দূতাবাসগুলোতে ইংরেজিতে অনূদিত বই বিলি করার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে–এগুলো কি তাদেরই কাজ হতে পারে না?

৫. আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে। তাই বাংলাদেশে মুসলিম জাতিসত্তাকে তারা মুছে ফেলতে চায়। যাতে করে ইসলাম-ইসলামী

www.amarboi.org

আন্দোলন-দাড়ি-টুপি-জিহাদ-শাহাদত এর মত পবিত্র দিকগুলোকে মানুষের নিকট উপহাসের পাত্র বানানো যায়। যা ইসলামকে হিংস্র, উগ্র, অমানবিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস।

৬. ক্ষমতা হারানোর বেদনায় আওয়ামী লীগ বেসামাল। যে কোনভাবে ক্ষমতা দখলই তাদের একমাত্র টার্গেট। তাই বোমা হামলা করে তারা সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

৭. প্রবাদবাক্য "ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাইনা"-এর মত কয়েক বছর আগে থেকে দেশে যখন বোমা হামলার নাম গন্ধও ছিল না তখন থেকেই চিৎকার করে আসছে। সুতরাং উদ্ভাবক আওয়ামী লীগ নিজেই।

৮. জামায়াতকে ক্ষমতা থেকে বাদ দিলেই বোমাবাজী বন্ধ হবে। এই ধীরস্থির ঘোষণা তারাই দিতে পারে যারা এটা পরিচালনাকারী ও মদদদাতা।

৯. বিগত মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীদের প্রত্যাশা ছিল আরও বড় ধরনের কর্মসূচির। কিন্তু শেখ হাসিনা ১ দিনের হরতাল দিয়ে সবাইকে হতাশ করেছেন। আর এর পরপরই শুরু হয়েছে দেশব্যাপী বোমা হামলা। তাহলে কি বলব না কর্মসূচি ১ দিনের হরতাল হলেও বোমাহামলাগুলো এর অন্তর্ভূক্ত?

১০. জেএমবি তাদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে আদালত প্রাঙ্গন ও বিচারকদের টার্গেট বানিয়ে এদেশে আল্লাহর আইন কায়েমের পথ রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্রই করেছে। জেএমবি কমান্ডার সানি বলেছে, এরপর তাদের লক্ষ্য ছিল বিজয় দিবস, থার্টিফাস্ট নাইটে হামলা চালানো। যাতে করে সহজে বলা যায় এগুলো জামায়াত-শিবিরেরই কাজ।

১১. আওয়ামী লীগ লাজ-লজ্জায় বা পরিস্থিতির কারণে গণতন্ত্রের কথা বললেও তারা আদতে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এই জন্যই একদলীয় বাকশাল কায়েম করেছিল। সুতরাং এই অগণতান্ত্রিক কাজ তারাই করতে পারে।

১২. জোট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামী লীগ রাজপথশূন্য। হরতালকে দেশের মানুষ প্রত্যাখান করেছে। সুতরাং ইস্যুর এটাই বিকল্প পথ।

১৩. শায়খ আব্দুর রহমান মির্জা আযম এমপি'র দুলাভাই বিধায় এ সকল অ্যাসাইনমেন্ট আওয়ামী লীগের হতে পারে।

১৪. সরকার সন্ত্রাস দমনে অনেকটাই সফল। গডফাদারসর্বস্ব আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় আসার পথ অনেকটাই অসম্ভব। তাই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েছে।

www.amarboi.org

১৫. আবার যদি বলা হয় এগুলো মোসাদ বা বিদেশীদের ষড়যন্ত্রেরই অংশ তাতেও আওয়ামী লীগ নারাজ হন।

অথচ জনপ্রিয় পত্রিকা যায়যায়দিন পত্রিকার ১০ সংখ্যায় জঙ্গি বিস্ফোরক আর ট্রেনিংয়ের উৎস শিরোনামে ইন্ডিয়া কানেকশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়েছে– গত ৭ ডিসেম্বর রাতে মেহেরপুরে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শায়খ আব্দুর রহমানের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে পরিচিত ইলিয়াস হোসেন। ইন্ডিয়া থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ঢাকায় আসার পথে শ্যামলী পরিবহনের কাউন্টারে তাকে এ্যারেস্ট করা হয়। তার সঙ্গে ছিল ইন্ডিয়ান সহযোগী ও বোমা বিস্ফোরণে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বোমারু মৃণাল কান্তি। সে পালিয়ে যায়। তবে ইলিয়াস পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, সে ইন্ডিয়ায় বোমা তৈরি ও আত্মঘাতি হামলার ব্যাপারে ট্রেনিং নিয়েছে। তার কাছ থেকে ট্রেনিংয়ের কাগজ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ। একই দিন খুলনা থেকে গ্রেফতার করা হয় বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার মহিউদ্দিন ফারুকীকে। ইন্ডিয়া থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী এনে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সরবরাহ করা হতো বলে সে জানিয়েছে। এছাড়া জেএমবির অন্যতম বিস্ফোরক সরবরাহকারী তরিকুলকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। জেআইসি-তে স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছে, এ যাবৎ কয়েক কোটি টাকার বিস্ফোরক ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসে সে জঙ্গিদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সে ৩০ জন কর্মীর মাধ্যমে দেশব্যাপী জেএমবির নেটওয়ার্কে বোমার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে দীর্ঘ দিন ধরে। এসব সংগ্রহের জন্য সে ইন্ডিয়ার বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় প্রয়োজনীয় অর্থও দিয়ে আসছে। জেএমবিকে বোমা সরঞ্জাম সরবরাহ করে যে আয় হয়েছে সেই টাকা রেখেছে রাজশাহীর দুটি বেসরকারি ব্যাংকে। ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত জঙ্গিদের অনেকেই ইন্ডিয়ায় ট্রেনিং নিয়েছে বলে গত সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিডিআর-বিএসএফ ডিজি পর্যায়ের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। সে সময় সাতক্ষীরায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ইন্ডিয়ার নাগরিক গিয়াস। সে জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে, পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত এলাকায় ছয়টি সেফ হেভেন তৈরি করে তারা ট্রেনিং নিয়েছে। তার স্বীকারোক্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে গোয়েন্দারা জানতে পারে, জনৈক মাওলানা মহসিন চব্বিশ পরগনার ভাদুরিয়ায় দীর্ঘ দিন থেকে প্রকাশ্যে জঙ্গিদের ট্রেনিং দিয়ে আসছে। এই তথ্য বিডিয়ারের ডিজি দিল্লিতে বিএসএফের ডিজিকে লিখিতভাবে প্রমাণসহ জানান এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল জঙ্গি ট্রেনিং শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। তার সেই মন্তব্য নিয়ে ইন্ডিয়ায় হৈ চৈ হয়। তবে বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকায় ছাপা হয় তারচেয়ে

www.amarboi.org

বেশি নেতিবাচক খবর। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এখনো কোন এক অজ্ঞাত কারণে জেএমবির জঙ্গিদের সাথে বিদেশী কানেকশনের বিষয়টি সচেতনভাবে তারা এড়িয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ায় অবস্থিত ট্রেনিংক্যাম্প ও প্রশিক্ষকদের কোন খবর তারা ছাপছে না। ডিবির হাতে গ্রেফতার হওয়া ইলিয়াস কোন দেশ থেকে এসেছে সেই তথ্য তারা চেপে যাচ্ছে। তার সঙ্গে ইন্ডিয়ার বোমারু মৃণালের সম্পর্ক কী তাও তারা প্রকাশ করছে না। বিপুল রহস্যের এ দিকটি একেবারে ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। অথচ সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করা যায়, জেএমবি যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে অশিক্ষিত যুবকদের আত্মঘাতী বোমারু হওয়ার মোটিভেট করছে, সেই জিহাদী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের অনেকে কেন হিন্দুস্তানে যাচ্ছে ট্রেনিং নিতে? আর ইলিয়াসের সঙ্গে মৃণাল কান্তি বাংলাদেশে ঢুকেছিল কী উদ্দেশ্যে? কেন ঢাকায় আসার পরিকল্পনা করেছিল? সেও কি ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম বা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইলিয়াসের সঙ্গে একত্র হয়েছে? এযাবৎ গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ঝালকাঠি, নেত্রকোনায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে তার সবগুলোতেই তদন্তকারীরা পেয়েছেন পাওয়ার জেল ব্যবহারের প্রমাণ। এ পর্যন্ত উদ্ধারকৃত পাওয়ার জেলগুলোর গায়ে ইন্ডিয়া এক্সপ্লোসিভ লিমিটেড, গোমিয়া, ঝাড়খন্ডের ছাপ পাওয়া গেছে।

গ্রেফতারকৃত তরিকুলও বলেছে সীমান্তের ওপার থেকেই বিস্ফোরক নিয়ে এসে সরবরাহ করতো। বিডিআর এ যাবৎ যে পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে, ধারণা করা হয় তার কয়েকগুণ ইতোমধ্যেই দেশের অভ্যন্তরে জেএমবির নেটওয়ার্কের হাতে পৌঁছে গেছে। পাওয়ার জেল বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহারের আগে রমনা বটমূল, ময়মনসিংহের সিনেমা হলে যেসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তাতে আরডিএক্স ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছিল। এগুলো এই অঞ্চলে ব্যবহার করে ইন্ডিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী। সে সময় এ নিয়ে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হওয়ার পর বোমা বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

এসব কিছুর পরেও আওয়ামী লীগের নজর জামায়াতের দিকেই, কারণ ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ পুরাতন প্লেয়ার। আওয়ামী লীগের সাথে জোট ভাঙ্গার ইন্ধনে জোটের ভেতর থেকে যারা সুরে সুর মিলান তারা কি জানেন যে বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দূর্যোগপূর্ণ সময়ে আসনসংখ্যা কম হলেও ভোট এককভাবে তাদেরই বেশি? সুতরাং জোটই আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসতে প্রধান প্রতিবন্ধক। সাথে সাথে একথাও ঠিক যে, বাংলাদেশে প্রায় শতাধিক আসন রয়েছে যেখানে এককভাবে হয়ত জামায়াত আগামী ২০/৩০ বছরে নির্বাচনে জিততে পারবে না।

www.amarboi.org

কিন্তু তাদের ভোটে বিএনপি জয় লাভ করে। এককভাবে এ সকল আসনে জামায়াত ভোটের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কাউকে জিতাতে অথবা পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সুতরাং আওয়ামী লীগ ঠিক অঙ্কটিই কষছে যে বিএনপি-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে বিএনপিকে জামায়াতমুক্ত করাই যথেষ্ট। এ হিসাব করেই আওয়ামী লীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করেছে। জামায়াতের বিরুদ্ধে এই হিংস্রযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের শিকার জোটের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও।

জোট ভাঙার ক্রীড়নক হিসেবে তারা প্রথম শিকার করে আবু হেনাকে। তিনি প্রথমে বললেন জামায়াত জঙ্গিবাদের মদদদাতা। রাজশাহীর মেয়র ও মন্ত্রী যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী তারাও নাকি জড়িত। এরপর বললেন খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানও নাকি মুক্ত নয়। অলি আহমেদ ও হুইফ আশরাফ, যাদের সাথে জোটের সূচনা থেকেই ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব, তারাও এর প্রতিশোধ নিয়েছেন এই মুহূর্তে। যেসব লোক বিএনপির স্থায়ী কমিটির পরিচয় বহন করে, পত্রিকা টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে জোট থেকে জামায়াতকে বের করার তালিম দেন, আলাদা নির্বাচনের পরামর্শ দেন, শুধু তাই নয় ৯৬ এর নির্বাচনেও আলাদা ইলেকশন করা উচিত ছিল বলে মনে করেন, তারা সুযোগ নিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিযোগ করে বলেন, ৪ বছর পর্যন্ত তাদের বৈঠক নেই, দলীয় নেত্রীকে তাই বলতে পারছেন না। আমি বলব, তারা যে দলের কেমন গুরুত্বপূর্ণ লোক এটা এমনিতেই বুঝা যায়।

যে যাই বলুক না কেন জামায়াত যে এ বোমা হামলার সাথে সম্পৃক্ত নয় তার পর্যালোচনাগুলো তুলে ধরা হলো:

১. জামায়াত আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায় রাসূল (সা) এর প্রদর্শিত পথে। আর রাসূল (সা) এ পথে চলতে গিয়ে জুলুম, নির্যাতন, দেশান্তর ও কারাবরণ করেছেন। কিন্তু জোর-জবরদস্তি বা হামলার মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করেননি, বরং সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রেও কোন ধরনের হঠকারিতার স্থান নেই।

২. জামায়াত গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী বলে ৬৯-৯৬ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল তৎপর এবং জনগণের রায়কে সুশৃঙ্খলভাবে সবসময়ই বরণ করেছে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মত সূক্ষ্ম-স্থূল কারচুপির অভিযোগ তোলেনি। এজন্য জামায়াত ৩ সিটে যেমনি হতাশ ছিল না, তেমনি ক্ষমতার অংশীদারিত্বে বেসামাল হয়নি।

www.amarboi.org

৩. সংগঠনের অভ্যন্তরেও জামায়াত গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী। আমীর থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে নির্ধারিত মেয়াদে নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়। এটাই গণতন্ত্রের চর্চা। কিন্তু এরকম গণতন্ত্র অন্য কোন রাজনৈতিক দল দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করতে পারেনি।

৪. সম্প্রতি ১টি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, বিগত কেয়ারটেকার আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা কথায় কথায় বলল মুজাহিদ সাহেব আপনাদের বোমা নেই লোক আছে, আর ইনু-মেননদের লোক নেই কিন্তু বোমা আছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় বোমা মারার রাজনীতিতে জামায়াত কখনও জড়িত ছিল না।

৫. আজকে যারা মওদূদীবাদ ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের গন্ধ খুঁজেন, তারা কি জানেন এ যাবৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও. মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর উপর ৬/৭ জন ছাত্রকে এম-ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত এই গবেষণায় তো কোন অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৬. জামায়াতে ইসলামী এখন সরকারের অংশ। সুতরাং কোন দুঃখে জামায়াত বোমাবাজি করবে?

৭. জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘদিনের অর্জন কয়েকটি বোমা মেরে শেষ করে দিবে এটা পাগলের প্রলাপ। আসলে গ্রামের প্রবাদটাই সত্য "পাগলে কিনা কয় ছাগলে কিনা খায়।"

৮. জামায়াত-শিবিরকে নিয়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারের কাল্পনিক রিপোর্ট যারা করেন, তারাই যখন আবার টিভি চ্যানেল ও পত্রিকায় ফোরকানিয়ার ছবি তুলে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সুপারিশ দেন এবং জামায়াতের রাজনীতি বন্ধের জিগির তোলেন, তখন তাকে কি বলা যায়? তাদের এটা দ্বৈতনীতি নয় কি? আসলে জামায়াত-শিবির আধুনিক শিক্ষিত ও মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল দল।

৯. যারা আজ বলেন জেএমবির সদস্যরা সাবেক জামায়াত শিবিরের লোক, আমি শেখ হাসিনা ও জলিল সাহেবদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা কী সংগঠনের সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ কাজটা সাবেক লোক ও বহিষ্কৃতদের দিয়ে করাবেন? একথাও ঠিক যে, সব দলেই নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে বহিষ্কারের পদ্ধতি থাকা স্বাভাবিক। বহিষ্কারের রাগ ও

www.amarboi.org

অভিমানে তারা অনেক কথাই বলে। কিন্তু চরমোনাই পীর সাহেবের নিজস্ব আবিষ্কার বাংলাভাই ও আবদুর রহমান নাকি জামায়াতের রুকন ছিলো। তাহলে এখন জামায়াত যদি বলে চরমোনাই পীর সাহেব তখন ঐ শাখার আমীরের দায়িত্বে ছিলেন, সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা তাদের বহিষ্কার করেছি। তাহলে আপনি কি উত্তর দিবেন? মিথ্যাচারেরও একটা মাত্রা থাকা উচিত। পূর্বে একদল করতেন এখন অন্য দলের এমপি-মন্ত্রী। তাহলে জামায়াত-শিবিরের সাবেক হলেও সে জঙ্গি জামায়াতই? অথচ এ পর্যন্ত শুধু চায়ের কাপেই ঝড় উঠেছে। জামায়াত-শিবিরের লোক এর প্রমাণ মেলেনি। বাপ-ভাই জামায়াত-শিবির হলেই যদি জেএমবি জামায়াত-শিবির হয়, তাহলে জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান আওয়ামী লীগের মির্জা আযম এমপির দুলাভাই, এই সূত্রে তো গোটা জেএমবিই আওয়ামী লীগ হয়ে যায়। শৃগাল কিন্তু কোন মানুষকে ভয় দেখাতে চিৎকার দেয় না, বরং নিজেই চিৎকার করে। আওয়ামী লীগের অবস্থাও কি তাই?

আজকাল একটি পত্রিকা জামায়াতে ইসলামী এবং সরকারের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে নেমেছে। যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে বলছে তাদের ব্যাপক কভারেজ দিচ্ছে। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন, যতই আওয়ামী বাম ঘরানা হওয়ার চেষ্টা চালানো হোক না কেন তা ওদের গুড়ে বালিই হবে। আর কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া মানে তো লোহার পিলারে মশার লাথি মারার সামিল।

জোট ভাঙার ক্ষেত্রে আজ একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ইসলামের পরিচয় দিতে তৎপর। বিশেষ করে চরমোনাই পীর, তরিকত ফেডারেশন প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে জামায়াত নাকি কোন ইসলামী দলই না। তাদের ভেবে দেখা উচিত তারা কার ক্রীড়নক এবং কার অর্থে লালায়িত হয়ে এগুলো করছে। দেশের সচেতন নাগরিক যে সবই বুঝেন এটা কি তারা জানেন? কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদী এর থেকে জঘন্য বিরোধীতাও নির্জনে সহ্য করেছেন।

প্রসঙ্গত, একদা ইসরার একটি মসজিদে মাওলানা মওদূদী জুমার নামাজ আদায় করেন। সেই মসজিদের খতিব ছিলেন মাওলানার বিরোধী। খতিব সাহেব সম্পূর্ণ খোতবায় জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। তার সামনে মাওলানা মওদূদী একজন মুসল্লী হিসাবে বসা ছিলেন। খোতবার উপসংহারে এসে খতিব সাহেব (ফতওয়া দিয়ে) বললেন যদি কোন মওদূদীবাদী মারা যায়, আর তার কবরের উপর উৎপন্ন ঘাস কোন ছাগল খায়, তাহলে সেই ছাগলের দুধ পান করাও

www.amarboi.org

হারাম। মাওলানা মওদূদীকে যখন বলা হল আপনার সমালোচনা করছে কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না কেন? এ ধরনের নীরবতা ও চুপ থাকায় আপনার ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে আমার সমালোচনা ও নিন্দা করে, তার জন্য আমার দুঃখ হয়। তার নেকির পরিমাণ এত বেশি যে এই খামাখা সমালোচনার কারণে হয়তো কিছু সাদকা আমার দিকে চলে আসবে, আর আমার আমলের কিছু অপূর্ণতা আমার নীরবতার কারণে দূর হয়ে যাবে।

"সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবসম্ভাবী" এই বাণী কোন দার্শনিক, কবি, বুদ্ধিজীবী অথবা বিজ্ঞানীর নয়, এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবিকৃত গ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী। প্রতিটি মুসলমান মানেই এটি বিশ্বাস করে যে তিনি নিরপেক্ষ ও সবকিছু জ্ঞাত ও উদঘাটিত, আন্দাজ অনুমান ও দোষারোপ মুক্ত। তিনিই সম্মান ও অসম্মানের মালিক। আর যারাই তার উপর অবিচল থাকবে তাদের সাহায্য করবেন এটাই তাঁর ওয়াদা। যারা আজ কাল্পনিক মিথ্যাচার করে যাচ্ছে তাদেরকে আল্লাহর নিকট অবশ্যই একদিন দণ্ডায়মান হতেই হবে।

সর্বোপরি বর্তমান এই সংকটময় মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট প্রত্যাশা, ক্ষমতায় এসে তিনি নিজ দলের সাংসদ ও মন্ত্রীপুত্র গ্রেফতারের, নিজ দলের লোকসহ সন্ত্রাসীদের দমনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের, সার্ক শীর্ষ সম্মেলন এবং জোট সরকারের ভাব মর্যাদা রক্ষায় আবু হেনাকে বহিষ্কারের মাধ্যমে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আগামী দিনেও দেশ-জাতি-মানবতা-গণতন্ত্র-সংবিধান ও ইসলামের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের এই নব্য ষড়যন্ত্রের মূল হোতা ও মদদদাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভূমিক রাখবেন- এটাই দেশবাসী আশা করছে।

মার্চ ২০০৬

www.amarboi.org

জোট সরকারের বর্ষপূর্তি : জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সম্প্রতি খ্যাতনামা একজন কলামিস্ট-এর লেখায় পড়লাম (তার নামটা আমার মনে নেই) তিনি বাংলাদেশের রাজনীতির একটা সরলীকরণের হিসাব দিয়েছেন এভাবে যে, "আওয়ামী লীগ একটা সুসংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী দল, আর বিএনপি একটা অসংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী দল। আওয়ামী লীগ নেত্রী প্রকাশ্যভাবে সন্ত্রাসীদের পক্ষে পল্টনে, ফেনীতে, লক্ষ্মীপুরে, নারায়ণগঞ্জে বক্তৃতা দেন ও সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করেন কিন্তু বিএনপি নেত্রীর দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় প্রকাশ্য সন্ত্রাসীর কথা স্বীকার না করলেও কার্যক্রম সবই চলছে।" গ্রামে বলে "ভাসুরের নাম সবাই জানে কিন্তু মুখে নেয় না"- আমি ভাবলাম সরলীকরণ মন্দ না। কথাগুলো বিএনপি'র ক্ষেত্রে এ মহূর্তে পুরোপুরি ঠিক না হলেও মিথ্যা নয়।

উন্নত দেশের সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতা মাপার ক্রোনোমিটারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পররাষ্ট্র নীতি, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি দিয়েই মূল্যায়িত হবে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। অবস্থা হচ্ছে "থাক ভিক্ষা তোর কুত্তা সামলা"। কিসের এসব হিসেব নিকেশ? যেদেশে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, ইজ্জত আব্রু ও সম্মানবোধ ক্ষুণ্ন হয় প্রতিটি মুহূর্তে, সে দেশের মানুষ উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে চায়না। কারণ আওয়ামী দুঃশাসনে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলো ১ অক্টোবরের নির্বাচনে একটি নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে হত্যা, জুলুম নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে জোট সরকারকে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত করেছে। দেখতে দেখতে জোট সরকারের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আওয়ামী দুঃশাসনে নিষ্পেষিত জনগণ যতটুকু আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে জোট সরকারকে বিজয় করতে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি আসনে ভূষিত করেছে, সেই সরকার মুক্তিকামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের পার্সেনটেইজে ততটুকু উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

একজন রোগীর যেমনি জীবনবিনাশী রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে ছোটখাট রোগগুলো আস্তে আস্তে শরীরে অনুভূত হয় ঠিক তেমনি আওয়ামী দুঃশাসনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষগুলোও জোট সরকারের কর্মকাণ্ডকে সেভাবে অনুভব করছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যাতাকল থেকে বাংলার জনগণ আজ মুক্ত। কিন্তু একথা ঠিক যে, আজ সন্ত্রাসের কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ-পোষকতা নেই। দেশের জনগণের আজও তেমনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, প্রতিরোধের মানসিকতা রয়েছে যেমনি সমুজ্জ্বল ইতিহাস ছিল ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধ, ৯০'র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কিন্তু সেই সাহসী ঐক্যবদ্ধতা, বিগত আওয়ামী

www.amarboi.org

সরকার সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের সাপোর্ট দিতে গিয়ে মানুষের এই প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মানুষ বুঝতো অন্যায়, অরাজকতা আর নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে আমি নিজেই হব আসামী। কিন্তু আজ তার পরিবর্তন হয়েছে।

জোট সরকারের যখন বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত হবে ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের আইন শৃঙ্খলা-পরিস্থিতি নাজুক বললে ভুল হবে না। পরপর চার জন ওয়ার্ড কমিশনার নিহত হওয়ায় দেশের মানুষ আতকে উঠেছে। বাকি ওয়ার্ড কমিশনাররা পুলিশ পাহারাধীন থাকায় রাজধানীর জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী যাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে ও যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা উভয়েই নিজ দলের। কিন্তু প্রশ্ন, তাহলে কি সন্ত্রাসমুক্ত দেশ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার পূরণে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলই বেশি দায়ী? চারজন ওয়ার্ড কমিশনার নিহত হওয়ার ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার। তাহলে প্রধানমন্ত্রী কি এ ব্যাপারে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশই করবেন? না উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন? ইতোমধ্যে শিশু হত্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিহাব, তৃষা, নওশিন, হৃদয় অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, যত্রতত্র লাশ পাওয়া যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, আমাদের দেশের অনেক বেকার বখাটে যুবক আছে যাদের অর্থ দিয়ে অনেক ঘটনা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য করানো সম্ভব। আর রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য নিজ দলের লোক হত্যা করা, গুম করা ইত্যাদিতে আওয়ামী লীগ শীর্ষে। উদীচী, রমনা বটমূল, সিপিবি, নারায়ণগঞ্জের শামিম ওসমানের অফিসে বোমা বিস্ফোরণ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আওয়ামী লীগ এই কর্মসূচি নিয়ে এগুচ্ছে। এ ব্যাপারেও জোট সরকারকে ভাবতে হবে।

"দেশের মানুষ এও মনে করে ৯১'র খালেদা জিয়া আর ২০০১ সালের খালেদা জিয়া এক নয়। এবার একজন মন্ত্রীর পুত্র, একজন প্রভাবশালী এমপি একজন এমপি ভ্রাতাকে গ্রেফতারের ঘটনা। জোট সরকারের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। শপথ গ্রহণের পর থেকে মন্ত্রী, এমপি ও নেতাকর্মীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে সত্যিই জোট নেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশনেত্রীর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনের মাধ্যমে দলের মধ্যে যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন তা পুরোপুরি না হওয়ায় দলের মধ্যে এখনো ইন্ধনদাতারা অবস্থান করছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের দৃঢ়তার সাথে সাথে ঘরের এ শুদ্ধি অভিযানে নজর দেয়া সময়ের অনিবার্য দাবি। তিনি এবার হিম্মত এবং সাহসিকতার সাথে যতটুকু করছেন তা ইতিপূর্বে আর কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তা ও কঠোরতায় নিজ দলের প্রত্যেকটি লোকই একথা উপলব্ধি করেছে যে, অন্যায় করলে সে যেই হোক রেহাই নেই।

www.amarboi.org

জাতি আজ আশ্বস্ত জোট সরকার দেশকে গড়তে চায়, দূর করতে চায় সন্ত্রাস-দুর্নীতি, ফিরিয়ে আনতে চায় সহনশীল রাজনৈতিক পরিবেশ। মানুষ আজ মুক্তি পেয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর লাগামহীন বক্তব্য, কটূভাষা, অন্যের ব্যক্তি চরিত্র হনন, মিথ্যাচার ও আশ্রয়-প্রশ্রয়ের রাজনীতি থেকে। চাঁদ যেমন সূর্য থেকে আলো পায়– ঠিক জোট নেত্রীরও এই শক্তির বিরাট উৎস জামায়াত, অর্থাৎ শরীক দল। আজ এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে জামায়াতের সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধতা একটি নিরাময় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত। একথা আওয়ামী লীগ ও বাম বুদ্ধিজীবীরা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছে বলেই মন্ত্রীত্বের পার্সেনটেইজ হিসেবে তারা জামায়াতকে টিট করে না বরং রাজনৈতিকভাবে বিএনপি এবং জামায়াতকে সমান সমান মনে করে। আর জামায়াতের দুই মন্ত্রীত্ব নিয়ে জোট সরকারে অংশগ্রহণ আওয়ামীলীগকে যেমনি মাতাল বানিয়েছে তেমনি আবার বিপরীত দিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সরকারের ভাবমূর্তি মজবুতি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনগণের প্রধান এবং মৌলিক সমস্যা জীবনের নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এটাকে প্রধানমন্ত্রী যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন বলেই ১০ অক্টোবর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আজ অবধি মন্ত্রী, এমপি এবং দলীয় লোকজনের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না, তবে করলে যে তিনি মহৎ এবং প্রিয়জন হতে পারেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা থেকে নিয়েছেন। একথা সকলেরই জানা বিগত সরকার দেশজুড়ে গডফাদারদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছেন, অথচ জোট সরকারের ১০ মাসে একজন গডফাদারেরও নাম শোনা যায়নি।

আওয়ামী লীগ পুলিশ ও দলীয় ক্যাডার দিয়ে চর দখলের মত হল দখল করে শিক্ষাঙ্গণের শিক্ষার পরিবেশকে চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল বছরের পর বছর। যে সেশন জটের যাঁতাকলে আজো দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রসমাজ পিষ্ঠ। শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, নকল, অনৈতিকতা, শিক্ষক লাঞ্ছিত, ধর্ষণের সেঞ্চুরি শিক্ষার পবিত্র অঙ্গণকে করেছে অপবিত্র। আর এই পরিস্থিতির উত্তরণে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করতে জোট সরকার যখন নকলের মরণব্যাধির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অসামাজিক কার্যক্রম রোধে ব্যবস্থা নিচ্ছে, নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানো এবং বিদেশী পদ্ধতি অনুসরণ করে আগামী দিনে সেমিস্টার চেয়ে বরাদ্দ ছাত্র অভিভাবকদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঈর্ষান্বিত আওয়ামী বামরা শিক্ষাঙ্গণে অরাজকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস সৃষ্টির মহাপরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, বুয়েটের মেধাবী

www.amarboi.org

ছাত্রী সনী হত্যার ঘটনাকে পুঁজি করে শুধু শিক্ষাঙ্গণের নয় বরং গোটা দেশে কয়েকটি সফল হরতালও সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু কেন? যেদেশের নেতানেত্রীরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সন্তানের শিক্ষা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও দ্বিধা বোধ করেন না, বুয়েটের মত শিক্ষাঙ্গণ বন্ধ করে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে পিছিয়ে রাখতে বিদেশী প্রভুদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেন, তারা আমাদের জাতীয় শত্রু। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। একই স্টাইলে তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার ধুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষকদের প্রাণনাশের কল্পিত কাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গণে নৈরাজ্য সৃষ্টির মাস্টারপ্লান নিয়ে আওয়ামী বামরা এগিয়ে চলছে। কিন্তু তারা মনে করেন বুয়েটে বামপন্থীরা ছাত্রদলের একটা অংশের যোগসাজশে সনী হত্যার ঘটনার আলামত হিসেবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ব্যানার পোড়ানোর ঘটনা দিয়ে শুরু করে, কিন্তু প্রথমেই এর বিহীত ব্যবস্থা হয়নি বলে টগর-মুকিরা সনী হত্যার ঘটনা ঘটিয়ে আওয়ামী বামপন্থীদের দেশব্যাপী জোট সরকারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম লিগ্যাল ইস্যুতে আন্দোলন করার সুযোগ করে দেয়। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে এদের কঠোর শাস্তি দিলেই চলবে না বরং দলের মধ্যে এর ইন্ধনদাতাদেরও চিহ্নিত করতে হবে। নচেৎ আগামী দিনের মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে।

আওয়ামী লীগ তার ফার্স্ট ইনিংসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট বন্ধ করে ভিসির পদত্যাগ করাতে সফল হয়। এরপর তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ছাত্রশিবিরের মজবুত অবস্থান। উলেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটে ছাত্রশিবিরের অনুপস্থিতি এবং ছাত্ররাজনীতি বন্ধ প্রশ্নে ছাত্রদলের অভিমানের সুযোগেই তাদের আন্দোলন সফল হয়েছে। অনেকেই মনে করেন প্রথমেই বিষয়টি সরকার রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করলে আওয়ামী লীগরা এ সুযোগ পেত না।

জোটভুক্ত ছাত্রসংগঠন হিসেবে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ছাত্রদলের ভূমিকাই মুখ্য হবে এটাই দাবি, কিন্তু তা না হয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অন্যায় আবদার কিছু জায়গায় ছাত্রদলের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। তার তুলনায় ভোটভুক্ত অন্য আরেকটি ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির সরকারের অংশীদার হিসেবে এর কোনটির সাথেই জড়িত নয় বরং তারা সাধ্যানুসারে সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তাদের আদর্শিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একথা সত্য যে, একটি সরকার প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করার জন্য দলীয় আদর্শে বিশ্বাসী লোকেদের ত্যাগের

www.amarboi.org

গুরুত্ব বেশি। এদিক দিয়ে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগ অনেকাংশে সফল। আওয়ামী লীগের নিজ দলের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যেভাবে পোষণ করেন, একজন মাঠপর্যায়ের কর্মীও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলেন। তারা নিজের চেয়ে দলের স্বার্থকে বড় করে দেখেন। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে গত এক বছরে জোট সরকার তাদের কমসূচি বাস্তবায়ন ও নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে যতটুকু ব্যর্থ হয়েছে তার মধ্যে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দলীয় নিয়ন্ত্রণহীনতাই অন্যতম দায়ী।

দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ পরপর দুইবার হয়েছে। দ্বিতীয়বারের অর্জিত চ্যাম্পিয়নশীপও আওয়ামী লীগের বপন করা বীজের ফসল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবার দুর্নীতি দমনে সোচ্চার। সম্প্রতি গম কেলেঙ্কারীতে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। বাকিদের চিহ্নিত করা সম্ভবত প্রক্রিয়াধীন। কিন্তু আওয়ামী আমলে স্বয়ং মন্ত্রী, এমপি এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের দুর্নীতির সচিত্র প্রতিবেদন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, নিজকরণ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে বিগত সরকার।

কিন্তু জোট সরকারের কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে এখনও ফলাও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে কৃষিমন্ত্রী ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী এক্ষেত্রে নজীর স্থাপন করেছেন। পত্র-পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বদলী, ফাইন, আত্মীয়স্বজন এবং দলীয় লোকদের চাপে ন্যুব্জ হয়ে আছে। জামায়াতের দুই মন্ত্রীর মন্ত্রণালয় তার থেকে মুক্ত।

আওয়ামী সরকার দেশের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুঁড়িতে পরিণত করেছে। ব্যাংক ঋণ নিয়ে সরকার পরিচালনায় সম্ভবত আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। এর করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন দেশের প্রখ্যাত আওয়ামী ঘরানার অর্থনীতিবীদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তার প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের ৩২০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশী নীট ইনভেস্টমেন্ট হয়। পরের বছর ১৯৯৮-১৯৯৯ তা কমে গিয়ে ২৬২.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পরের বছর তা আরো কমে"। তিনি দেখিয়েছেন সে সময় দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির কারণে অনেকে বিনিয়োগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেয়ার উদ্যোগও নিয়েছে। আওয়ামী শাসন আমলে দেশের আমদানি-রপ্তানি অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে চরম নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে মাত্র ৫.১৫% ভাগ আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে ৬.৪৬% হয় এবং আরো করুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দেশের অর্থনীতি বিপুলাংশে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্মরণকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। ১৯ বার টাকার ডিভ্যালিমেশন বা

www.amarboi.org

অবমূল্যায়ন, ১ মার্কিন ডলার সমান ৪০ টাকা ৫৯ টাকা দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে স্টক এক্সচেঞ্জে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের গরিব ও ক্ষুদ্র হাজার হাজার বিনিয়োগকারীর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় ভারত। ১০ কোটি টাকার রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে দেখা যায় কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সন্ত্রাসী মাস্তানদের সমঝোতার মাধ্যমে ৩০/৪০ শতাংশ ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে ঠিকাদার চাঁদা অস্বীকার করায় জীবন দিতে হয়েছে। যদিও এক দিনে অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তবুও বর্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী বিনিয়োগ দাতা দেশগুলোর মানসিকতা যখন পরিবর্তন হয়েছে, উলেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ পরিকল্পিত উপায়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থির অবনতি, শিক্ষাঙ্গণে অরাজকতা সৃষ্টি, ওয়াদা ভঙ্গ করে বারবার হরতাল দিয়ে অর্থনীতির উন্নতি ব্যহত করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী জুটমিল বন্ধের যুগোপযোগি সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক রিজার্ভের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। তেল গ্যাস আমাদের জাতীয় সম্পদ। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে কোন সুযোগ না দিয়ে বরং সরকারকে পঞ্চাশ বছরের তেল গ্যাস মজুদ রেখে রপ্তানির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোট সরকারকে আরো অনেক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সম্পদের ব্যবহারকে দারিদ্র্যমুখী করে তাদের অবস্থা উন্নয়ন হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে একই হারে দারিদ্র্য কমবে। ইসলাম হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে নৈতিক সীমারেখা টেনে যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনীর সম্পদ দরিদ্রমুখী করা দরীদ্র ও অসহায়ের প্রতি দান-খয়রাতকে উৎসাহিত করা, মানুষকে কর্মমুখী ও আয় উপার্জনে উৎসাহিত করার প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ভারসাম্যের মধ্যে নিয়ে আসতে পারলেই শুধু মানুষ আবার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে।

বিগত দিনে যারা সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে থেকে বর্তমান সরকারের প্রকাশ্য পক্ষ অবলম্বন করে বিরোধী নেতা-কর্মীদের ঠেঙ্গিয়ে রাজনৈতিককর্মী ভূমিকা পালন করেছেন। সরকার দলীয় অনেকেই আত্মীয়তা এলাকা ও আগামী দিনের কথা ভেবে ব্যালেন্সের রাজনীতি করছেন এ অভিযোগ উর্দ্ধতন এমপি মন্ত্রী থেকে অধঃস্তন পর্যায় পর্যন্ত। সচিবালয় থেকে স্থানীয় প্রশাসন পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইমারি পর্যন্ত। অথচ সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ এখানেও দলীয় লোক নিয়োগ করেছে আওয়ামী লীগ। এই খাতির গত পাঁচ বছর তারা করেনি। এবার ক্ষমতায় আসলেও তা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিত। তাই স্থানীয় প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ সরকার নিয়েছে সে ক্ষেত্রে বিষয়গুলোর প্রতি

www.amarboi.org

যথার্থ গুরুত্ব দিতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রশাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, মেম্বার, ওয়ার্ড কমিশনার পর্যায় পর্যন্ত দলীয় লোক সেট করতে পেরেছে বলে তারা অনেক কর্মসূচি সেন্ট্রালি না দিলেও বাস্তবায়ন করতে পারে। বিএনপি'র দলীয় কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগের বিজয়ের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ঘটছে। আগামী দিনে চেয়ারম্যান এবং মেম্বার ইলেকশনে তৃণমূল পর্যায়ে জোট প্রার্থীর মূল্যায়ন করতে হবে। নচেৎ বিপদ ঘনীভূত হবে।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ অঙ্গীকার পূরণে জোট সরকার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগকে কটাক্ষ করে বিচারপতিদের আসামী জামিনের ব্যাপারে জবাবদিহি চান। কালো আইনের অসৎ উপায়ে রাজনৈতিক স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রীর নেতৃত্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করা হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে মুখ সামলিয়ে কথা বলতে হাইকোর্টের নির্দেশ দিতে হয় তখন বেশ অবাক হতে হয়। একটি লাশের পরিবর্তে ১০টি লাশ, বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত চরিত্র হনন, কুৎসিত ও অমার্জনীয় ব্যবহার, ভাষা, জিয়াউর রহমান এর লাশ সম্পর্কে কটূক্তি ইত্যাদি অভাবনীয় ন্যক্কারজনক আচরণ স্বয়ং সাবেক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হওয়ায় রাজনৈতিক শিষ্টাচারকে ভুলুণ্ঠিত করেছে চরমভাবে। আর তখনই মূলত দেশের সরলপনা মানুষগুলো নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণকে উপলব্ধি করে। এখন এ সকল ঘটনার কোনটিই ঘটছে না। এর হাত থেকে জাতি আজ মুক্তি পেয়েছে।

আজকের তথ্যপ্রযুক্তি যুগে বিএনপি মিডিয়ার দিক থেকে এখনো অনেক উদাসীন। তাই গত ১ বছরে জোট সরকারের অর্জিত সাফল্য মানুষের সামনে তুলে না ধরে কতিপয় পত্রপত্রিকা তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে দেশে সরকারের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অদ্যাক্ষর 'জ' দিয়ে পত্রিকা ভারতের র'এর টাকায় পরিচালিত হয়, বাংলাদেশের মিডিয়ার এ পত্র পত্রিকা জগতের নিয়ন্ত্রণ আজও বামপন্থীদের হাতে। সুতরাং তাদের থেকে সমালোচনা ছাড়া অন্য কিছু আশা করা যায় না এটাই স্বাভাবিক। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তৎকালীন বাকশাল সরকার তার শ্বৈরশাসনের অংশ হিসেবেই The Newspaper (Anouncement of Declaration) Act 1975 জারি করে ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়। আজও ১৬ জুন সংবাদপত্রের "কালো দিবস" হিসেবে পালিত হচ্ছে। বিগত দিনে আওয়ামী নির্যাতনে প্রায় ১০ জন সাংবাদিককে জীবন দিতে হয়েছে। প্রায় শতাধিক নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু আজ সাংবাদিকরা সে নির্যাতনের হাত থেকে

www.amarboi.org

রক্ষা পেয়েছে। আওয়ামী ঘাতকদের হাতে নিহত সাংবাদিক শামসুর রহমানের স্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেয়া, বর্তমান সময়ে কথিত কলম সৈনিকদের জোট সরকারের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস জাতির গালে একটি চপেটাঘাত।

একুশে টেলিভিশনের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ড. চৌধুরী হাসান মাহমুদের মত কিছু দেশপ্রেমিক ইসলামপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাই মূখ্য। যার শেয়ার হোল্ডার ছিলেন দু'ইহুদিও। সেখানে সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই। আজ প্রচার মিডিয়া আওয়ামী লীগের ৭০% কমসূচি বাস্তবায়ন করে দিচ্ছে। সুতরাং জোট সরকারকে মিডিয়ার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাপ-বেটির বাক্স হিসেবে পরিচিত টেলিভিশন এখন জনগণের টেলিভিশনে পরিণত হয়েছে। পরিবেশ দূষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করতে জোট সরকার পুরাতন গাড়ি ব্যবহার নিয়মনীতি বেধে দিয়েছে। জমির উৎপাদন ক্ষমতা ঠিক রাখতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ একটি সর্বজনস্বীকৃত ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে জোট সরকার। বিগত দিনে আওয়ামী লীগ বিসিএস-এ যেভাবে দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগ দিয়ে আওয়ামীকরণ করেছে তার শিকার এদেশের মেধাবী ছাত্র সমাজই নয় বরং জাতি হয়েছে মেধাশূন্য। দেশকে সাম্প্রদায়িক বন্ধনমুক্ত করতে আওয়ামী লীগ আগামী দিনে হিন্দুদের পূঁজাকে ভণ্ডুল করতে গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাবে যার দায়ভার জোট সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তাই জোট সরকারকে আওয়ামী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে যেমনি সচেতন থাকতে হবে তেমনি জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি পূরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

অক্টোবর ২০০২

www.amarboi.org

মাদ্রাসা ছাত্রদের সম্ভাবনাকে হত্যা করা হবে আর কতদিন

বাংলাদেশ একটি সৌহার্দ্য-শান্তিপূর্ণ মুসলিম দেশ। এদেশে মন্দিরে যেমন পূজা অর্চনা করতে কারো কোন বাধা নেই তেমনি কোন হিন্দু ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এমনকি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও ভর্তি হতে কোন বাধা নেই। কিন্তু সাম্প্রতিককালে কিছু জ্ঞানপাপী হিংস্র শিক্ষাদানবের কীর্তি দেখে হৃদয়ের সব সৌন্দর্যবোধ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠে। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ শুধু মাদ্রাসা ছাত্ররাই করবে না বরং সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করবে।

জাতীয় দৈনিকে খবর বেরিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। সেখানে তাদের অযৌক্তিক এবং খোড়া অজুহাত হিসেবে এইচএসসিতে বাংলা এবং ইংরেজি ২০০ মার্ক থাকতে হবে। অথচ সরকারের নিয়মেই মাদ্রাসা ছাত্ররা ১০০ মার্ক ইংরেজি নিয়ে এইচএসসির মান পাচ্ছে। বিষয়টা যাই হোক যদি মাদ্রাসা ছাত্ররা ১০০ মার্ক ইংরেজি পড়ার কারণে তাদের ইংরেজিতে দুর্বলতা থেকেই থাকে তাহলে ভর্তি পরীক্ষায় তারা ব্যর্থ হবে এতে আবার শর্তারোপের প্রয়োজন কী! ঢাবিতে মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্ররা ইংরেজি, আইন, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন বিভাগের সফল শিক্ষক হিসেবেও নিয়োজিত আছেন।

এরপরেও কথা থেকে যায় বাংলাদেশের মেডিক্যাল কলেজ, বুয়েট, রুয়েট, চুয়েট, খুয়েট, রাবি, চবি, ইবিসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মাদ্রাসা ছাত্ররা অবাধে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারছে সেখানে ঢাবি'র আট বিভাগের শিক্ষাদানবদের আপত্তি এবং অভিনব অপনিয়মের যথার্থ অর্থ কী তা জানতে চায় বাংলাদেশের সকল স্তরের শিক্ষার্থী। ঢাবি ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এ বিষয়ে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মেধা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যায়ে তাদের ভর্তিতে কোন সমস্যা হোক আমরা তা চাই না। তিনি আরও বলেন, একটি বিভাগ ইচ্ছা করলেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ভর্তি কমিটিই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

নিয়ম অনুয়ায়ী একাডেমিক কমিটি ফ্যাকালটি কমিটি হয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে সুপারিশসহ সিন্ডিকেটে পাস হতে হয়। অথচ বিধিটি পাস না হয়েও গত বছর শুধু ভর্তি নির্দেশিকায় থাকার কারণে মাদ্রাসা ছাত্ররা সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হতে পারেনি।

www.amarboi.org

অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে, কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিজেদের উদার এবং প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চান, মাদ্রাসা ছাত্রদের বঞ্চিত করার মাধ্যমে। তারা যেমন এদেশের সন্তান মাদ্রাসার ছাত্ররাও এই দেশেরই সন্তান। মাদ্রাসার ছাত্ররাও একই পতাকা হাতে নিয়ে দেশ রক্ষার বিপ্লবী শ্লোগানে নিজের রক্তে রাজপথ পিচ্ছিল করবে যেমন বরকতরা করেছিলো বাংলা ভাষার জন্য। সুতরাং এক মায়ের সন্তান হয়ে কেউ অধিকার পাবে আর কাউকে অধিকারের জন্য যুদ্ধ করতে হবে এমন দেশ তো আমার সোনার বাংলাদেশ নয়!

ইংরেজ বেনিয়ারা যখন এদেশের মানুষকে শোষণ নির্যাতন করে দুর্ভিক্ষ দিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছিল, তখন সুবিধাভোগী হিন্দু জমিদার বহাল তবিয়তে নিজেদের সুখের সৌধ বিনির্মাণ করেছিল, আর মুসলমানদের শিক্ষা পুনরুদ্ধার অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন দিতে হয়েছিল তিতুমীর, মুন্সী মেহেরউল্লাহ, দুদুমিয়া প্রমুখ মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে। রবীন্দ্র শিক্ষায় যখন মুসলমানদের ঠাঁই ছিল না ঠিক তখনি মুসলমানদের শিক্ষার সুব্যবস্থা তৈরিতে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ পরিতাপের বিষয় কিছু জ্ঞানপাপীরা আবার মুসলমানের দেশে মুসলিম ছাত্রদের সাংবাদিক হতে দেবে না, অর্থনীতিতে পড়তে দেবে না, লোকপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, বাংলা এবং ইংরেজিতে পড়তে দেবে না। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে এই ধরনের হিংস্রতা প্রয়োগ করে ছাত্রদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১৯৬০ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় দাবি পেশ করেন। যার অন্যতম দাবি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। হিন্দুদের চক্রান্তে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি ভারতের বড়লাট নবাবকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। কিন্তু অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সাথে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ আশ্বাসের চরম বিরোধিতা করেন। এছাড়া হিন্দু সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সভার সিদ্ধান্তগুলো ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করতে থাকেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ব্যানার্জী, ড. স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বড়লাট হার্ডিঞ্জের কাছে ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করেন। শুধু তাই

www.amarboi.org

নয়, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে ব্যঙ্গোক্তি করতেন। তাহলে আমরা ধরে নেব এসব কীর্তি মূলত রবীন্দ্র চেতনাধারীদেরই অতীত পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি?

মাদ্রাসা ছাত্ররা দেশের নাগরিক হিসেবে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোরই নেই। তবে এটা মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় কি?

নীতিনৈতিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতার মাপকাঠিতে অন্যদের চেয়ে মাদ্রাসা ছাত্ররা এগিয়ে আছে এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। সুতরাং কিছু মতলববাজ শিক্ষাদানবের খায়েশ ফরমায়েশের বশবর্তী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের নেতিবাচক সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকবেন বলে আমরা আশা করছি এবং এ বছর থেকেই মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ না করে তাদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানাই। তা না হলে এদেশের প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের অংশগ্রহণে তা সফল হয়েছে। রাজপথে নামতে যেন ছাত্রদের না হয় সে ব্যাপারে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশু দৃষ্টি প্রত্যাশা করি।

জুন ২০০৯

www.amarboi.org

সংবাদপত্র ও বামপন্থীদের আন্দোলন

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ শামসুন্নাহার হলের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিসির পদত্যাগ আওয়ামী বামপন্থীদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা দ্বিতীয় টার্গেট বানিয়েছে। এর কারণ হলো এক সময়ের বামপন্থীদের রাজধানী হিসেবে খ্যাত ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। কিন্তু কালের আবর্তনে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফলে তারা দীর্ঘদিন থেকে ইসলামী শক্তির উত্থানকে বিপাকে ফেলতে খুঁজতে থাকলো বিভিন্ন ইস্যু। ২০০১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের সাথে সৃষ্ট ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যার দায়ভার অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা একটি ছাত্রসংগঠনের উপর চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। তারা গত ৯ এপ্রিল একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোটভূক্ত ছাত্রসংগঠন ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। টার্গেট ছিল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জোটপ্রার্থী মিজানুর রহমান মিনুকে হারিয়ে আওয়ামী ও বাম আন্দোলনের সমর্থিত প্রার্থী, শিবিরের প্রায় ১০ জন নেতার অন্যতম খুনী বাদশাকে বিজয়ী করা। কিন্তু বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এমনকি নিজেদের মধ্য থেকে ৩ জন প্রার্থী হওয়ার পরও জোট প্রার্থীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতাত্তোর এই প্রথম বিজয় নিশ্চিত করে ইসলামী ছাত্রশিবির। আর তখন থেকে আওয়ামী বামরা শিবিরের বিরুদ্ধে নীল নকশা আঁকতে থাকে। সূত্র মতে সিটি কর্পোরেশনে পরাজিত হয়ে নির্বাচনত্তোর বর্তমান সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ নাটক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতেই তৈরি করা হয়েছে। গত কয়েক মাস থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাদের এই চক্রান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন খবর পরিবেশিত হয়েছে। আর এর নেপথ্যে রয়েছে র'এর এজেন্ট রাজশাহীর ভারতীয় হাইকমিশনের কতিপয় বেতনভুক্ত শিক্ষক আর বামপন্থী সাংবাদিকরা।

গত ৩১ জুলাই সাংবাদিক ইউনিটের নামে বিশ্ববিদ্যালয় বিধি লঙ্ঘন করে বিনা অনুমতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উষ্কানীমূলক বক্তব্য দেয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর তাদের শোকজ নোটিশ প্রদান করে। কিন্তু তারা উল্টো প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম প্রদান করে এবং সাথে সাথে "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিবিরের দখলে" এবং "সংখ্যালঘুর উপর শিবির ক্যাডারদের নির্যাতন" নামে দুটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উষ্কানীমূলক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এর মাধ্যমে তাদের টার্গেট ছিল প্রশাসন ও

www.amarboi.org

শিবিরকে উত্তেজিত করে ক্যাম্পাসে আন্দোলনের একটি ইস্যু তৈরি করা। কিন্তু শিবির আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় তাদের এক ঢিলে দুই পাখি শিকারের টার্গেট ভণ্ডুল হয়। ফলে বাম সাংবাদিকরা শিবিরকে জড়াতে না পেরে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে ব্যর্থ হওয়ায় তারা প্রশাসনের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে লেজ গুটিয়ে তাদের আন্দোলন ক্লোজ করে নেয়।

তাই আজকে যে তথাকথিত আন্দোলন হচ্ছে ছাত্রীদের উপর হামলার প্রতিবাদে, এই আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল সাংবাদিক সিং ইস্যুকে কেন্দ্র করে। আর সেখান থেকেই তারা মূলত প্রক্টরের বিরুদ্ধে সোচ্চার। খুঁজতে থাকে একটি ইস্যু। আর আওয়ামী বামপন্থীরা একটি ডেড ইস্যুকে পুঁজি করে ধর্মঘটের নামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির জন্য এই মোক্ষম সময়কে বেছে নেয়। গত ২৮ ও ২৯ তারিখে ইসলামী ছাত্রশিবির ইসলামী শিক্ষাদিবস উপলক্ষে আয়োজন করে এক ব্যতিক্রমধর্মী বিজ্ঞান মেলা, স্বাক্ষর অভিযান, ব্লাড গ্রুপিং ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর। লাইব্রেরি চত্বরে এই অপরূপ আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী আনন্দের সাথে উপভোগ করেছে। মন্তব্য খাতায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর আবেদন ছিল শুধু একটাই, বিজ্ঞান মেলার সময়সীমা আরো কয়েকদিন বাড়ানো হোক। এখানে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অনেক বিজ্ঞান ক্লাব, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় শতাধিক প্রকল্প প্রদর্শিত হয় এই বিজ্ঞান মেলায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান মিনু। মেলা উদ্বোধন করেন জামায়াতের রাজশাহী মহানগরীর আমীর জনাব আতাউর রহমান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম বুলবুল, ড. এম নজরুল ইসলাম, প্রফেসর এম. উমার আলীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবী যখন ব্যাকুল, সেই মুহূর্তে একটি ছাত্রসংগঠনের আয়োজনে এ জাতীয় প্রোগ্রাম সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তাহলে প্রশ্ন, শিক্ষকরা কিভাবে পারেন বিজ্ঞান মেলার মত একটি শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান ভণ্ডুলের চক্রান্ত করতে? কিভাবে পারেন ছাত্রীদের সামনে ঠেলে দিয়ে লাঞ্ছিত ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে? একজন শিক্ষকের নিকট ছাত্রী এবং মেয়ের পার্থক্য কোথায়? ২৭ তারিখের ধর্মঘটে মেয়েদেরকে তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কথিত ছাত্রী লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ তুলে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এমন একটি মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ নিয়ে শিক্ষকরা র‍্যালি ও বক্তব্য রাখতে পারেন এটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের নিকট জাতি আশা করে না। কিন্তু

www.amarboi.org

এ নোংরা রাজনীতি আমাদের সেই বর্তরতা থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে তুচ্ছ ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরিয়াল বডির বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা করার চিন্তা ভাবনার খবর যখন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন মনে হয় ধিক শিক্ষকদের এই নোংরা রাজনীতি, ধিক বিদ্বেষ চিন্তাপ্রসূত এই জ্ঞানকে। অথচ আজকে যারা কর্থিত ছাত্রী লাঞ্ছিত হবার জিগির তুলছে তাদের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা একাধিক ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে। কিন্তু তারা কোন সুষ্ঠু বিচার করতে পারেনি।

বামপন্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাইলে এখন প্রক্টরের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রশাসনের প্রক্টরের রয়েছে দৃঢ় অবস্থান। তাই ছাত্রদলের একটি অংশের পথের কাঁটা এই প্রক্টর। সাংবাদিকদের শো-কজ সব মিলিয়ে ত্রিমুখী থাবার শিকার এখন তিনি। তাই বামপন্থীদের জিগিরে যদি তারা প্রক্টরকে বলির পাঠা বানাতে পারে তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি হবে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ বিজয় এবং পরপরই তারা একই অভিযোগে অভিযুক্ত করে ভিসি পদত্যাগের মাতম তুলবে। এই মাস্টার প্লান নিয়ে আজ বামপন্থীরা ময়দানে সোচ্চার। তাই জোট সরকার এ চ্যালেঞ্জগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হলে চরম বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন আওয়ামী বামপন্থীরা তাদের পছন্দকৃত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ করা এবং জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে ভাঙন সৃষ্টির জন্য এই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করেছে। তাহলে কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ডজন নামধারী ছাত্রছাত্রীর নিকট ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন জিম্মি? না, তা নয়। বরং এই মুহূর্তে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জোটভূক্ত ছাত্রসংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সময়ের দাবি। প্রয়োজন আওয়ামী বামপন্থীদের চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর। তাহলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আওয়ামী বামপন্থীদের এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সুবহে সাদিকের স্নিগ্ধ আলো ম্লান করে দিবে।

www.amarboi.org

রাবিতে ড. তাহের হত্যা : সংবাদের পোস্টমর্টেম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক, সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. এস তাহের আহমেদ নির্মম ও নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন, যা স্তম্ভিত ও হতবাক করেছে সকলকে। কলঙ্কিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসকে। যারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তারা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নয় বরং দেশ ও মানবতারও শত্রু। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে এই পাষণ্ড হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে তীব্র গণআন্দোলন। শঙ্কিত হয়ে পড়ে ঘাতকরা এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা ছাত্রসমাজ।

ড. তাহের নিখোঁজ এবং পরে লাশ উদ্ধার

জানা যায়, ড. এস তাহের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক পদোন্নতি সংক্রান্ত প্ল্যানিং কমিটির সভায় যোগ দিতে গত ০১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে রাবি ক্যাম্পাসে আসেন। তিনি ঐ দিন আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপাড়াস্থ বাসভবন ২৩ বি'তে এসে পৌঁছান। বাসায় এসে তিনি ঢাকায় তার পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথাও বলেন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবার ও সহকর্মীরা মোবাইল ফোনে পাননি। বহু খোঁজাখুঁজির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উপস্থিতিতে পুলিশ তার বাসার পেছনের একটি ম্যানহোল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। একে কোন জাতির জন্য কলঙ্কের ছাপ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

হত্যাকাণ্ডে যারা গ্রেফতার

লাশ উদ্ধারের আগেই ড. তাহেরের বাসার কেয়ারটেকার ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীরকে পুলিশ সন্দেহজনকভাবে আটক করে। পরে সে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশ তার আত্মীয় নাজমুল, বড় ভাই ছালাম ও সোহরাব এবং পিতা আজিমুদ্দীনকেও গ্রেফতার করে। আবদুস ছালামকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ রক্ত মাখা একটি ছুরিও উদ্ধার করে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। রিমান্ডে নেয়া জাহাঙ্গীরের দেয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ তার বাড়ি থেকে ড. তাহেরের মোবাইল ফোন এবং নগরীর কাদিরগঞ্জে তার খালাত বোনের বাড়ি থেকে ট্রাভেল ব্যাগ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিনকেও গ্রেফতার করা হয়।

কে এই জাহাঙ্গীর?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা খোজাপুরের আজিমুদ্দীন ওরফে ওয়াজেন মুন্সির ছেলে জাহাঙ্গীর। মির্জাপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময় প্রফেসর ড. তাহেরের সাথে

www.amarboi.org

তার পরিচয় হয়। উল্লেখ্য যে, ড. তাহের উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই জাহাঙ্গীর এক সময় জনৈক প্রতিবেশীকে ছুরিকাঘাত করে চার মাস ভারতে পালিয়ে ছিল। এই জাহাঙ্গীরই ঝালকাঠিতে দুই বিচারকের উপর আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী মামুনের ঘনিষ্ঠ সহচর, যার বাড়ি নগরীর ডাঁশমারী এলাকায়। ড. তাহের হত্যাকাণ্ডের আত্মস্বীকৃত এই খুনী জাহাঙ্গীর মহানগর ছাত্রলীগের ২৯ নং ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক।

হত্যাকাণ্ডের পরপরই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নিম্নরূপঃ

৫ ফেব্রুয়ারি, জনকণ্ঠ

ঐ রাতে কী ঘটেছিল?

কেয়ারটেকারকে না জানিয়ে বুধবার রাতে ড. তাহের আহমেদ ক্যাম্পাসের ফ্লাটে পৌঁছেন। কয়েক মাস যাবত তিনি কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীরকে নিয়ে বিশাল ফ্ল্যাটে বসবাস করে আসছিলেন। সেদিন রাতে ঢাকা থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে তিনি কি এমন কোন দৃশ্য দেখেছিলেন, যার জন্য তাকে নৃশংসভাবে খুন হতে হল? সূত্র মতে, ড. তাহের আহমেদের অনুপস্থিতিতে জাহাঙ্গীর নিজে বা তার সহযোগিতায় ক্যাম্পাসের কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী ওই ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করত। ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে, ড. তাহেরের অনুপস্থিতিতে ওই বাড়িতে যাতায়াত করত এমন এক নারীর নাম আলোচিত হচ্ছে। এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। একই সূত্রের সন্দেহ, ড. তাহেরের সঙ্গে বসবাসের সুবাদে জাহাঙ্গীর তার বাসার মালামাল ও টাকা-পয়সার খোঁজ পেয়ে যায়। ওই টাকা-পয়সার লোভেই হয়ত সে অপরাধী চক্রের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। ড. তাহের যেদিন ঢাকা থেকে রাজশাহী আসেন সেদিন তার হাতে একটি ট্রাভেল ব্যাগ ছিল। কিন্তু তার ওই ব্যাগটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি ছিল ওই ট্রাভেল ব্যাগে যা খুনিরা নিয়ে গেছে? তাঁর পরনের প্যান্ট, পকেটে একটি রুমাল ও একটি চিরুনি ছাড়া ফ্ল্যাটে উপস্থিতির আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বাসায় আসেননি এটা প্রমাণ করতেই খুনিরা লাশ ম্যানহোলে ঢুকিয়ে দেয়।

৬ ফেব্রুয়ারি, জনকণ্ঠঃ

ক্যাম্পাসে কে ঐ তরুণী?

আসামীদের প্রাথমিক স্বীকারোক্তিসহ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো ছোরাটি পুলিশ গ্রেফতারকৃত আব্দুল ছালামের বাড়ি থেকে শনিবার রাতে উদ্ধার করে। পুলিশ এই নৃশংস খুনের সঙ্গে জড়িত আরও ২/১ জনকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সন্দেহভাজন সকলকে পাওয়া গেলেই সবকিছু জানা যাবে বলে রবিবার পুলিশ কর্মকর্তারা জানান। এছাড়া পুলিশ সন্দেহভাজন খুনিদের নেপথ্যে গডফাদার রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করেছে।

www.amarboi.org

এদিকে প্রফেসর তাহের খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত ধারালো ছোরাটি পুলিশের উদ্ধার নিয়ে ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তাঁর (ড. তাহের) ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সূত্রে জানা গেছে, 'হ্যাভি ব্লান্ট উইপনের (ভারি ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত) ফলে কালশিরা (রক্ত জমাট বাঁধা) এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। এছাড়া মাথার পিছনের ডানদিকে হাড় ভেঙ্গে দুই ইঞ্চি পরিমাণ গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানেও ছিল ভারি ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন। তবে তাঁর মাথা, ঘাড় কিংবা শরীরের কোথাও ছুরিকাঘাত কিংবা ধারালো অস্ত্রের আঘাত পাওয়া যায়নি বলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সংশ্লিষ্ট এক চিকিৎসক এক প্রশ্নের জবাবে রবিবার জনকণ্ঠকে জানান।

ড. তাহেরের অনুপস্থিতিতে কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর ও তার সহযোগী অথবা তাদের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসের কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী ওই ফ্ল্যাটে মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করত। ওয়াকিবহাল সূত্রের মতে, ড. তাহেরের অনুপস্থিতিতে ওই বাড়িতে যাতায়াত করত এমন এক নারী আলোচনায় এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী না হলেও রাবি'র চারুকলা চত্বরসহ ক্যাম্পাসে ওই তরুণীকে প্রায়ই দেখা যায়। পুলিশ আলোচিত ওই তরুণীর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। ওয়াকিবহাল সূত্রের সন্দেহ, কেয়ারটেকারকে না জানিয়ে বুধবার রাতে ড. তাহের আহমেদ ক্যাম্পাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছেন। সেদিন রাতে ঢাকা থেকে ফ্ল্যাটে ফিরে তিনি কি এমন কোন দৃশ্য দেখেছিলেন, যার জন্য তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হতে পারে? ড. তাহের খুনের রাতে তরুণীটি ওই ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কিনা তা সূত্র নিশ্চিত করতে পারেনি। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

ঘটনাস্থলে পাওয়া আংটি, কামিজ, ওড়না কার?

ড. তাহের আহমেদকে যেখানে নৃশংসভাবে খুন করা হয় সেখানে রক্তমাখা কার্পেটের ওপর একটি স্বর্ণের আংটি, কামিজ ও ওড়না পাওয়া গেছে। ওই আংটির মালিক কে? কামিজ ও ওড়নাই বা কার? গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর, আব্দুল ছালাম ও নাজমুল সকলেই আংটির মালিকানা অস্বীকার করছে। তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আংটির মালিককে খুঁজছেন বলে জানা গেছে। তবে আংটি সম্পর্কে পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা হ্যাঁ অথবা না কিছুই বলেননি। কামিজ ওড়নাই প্রমাণ করে যে ঘটনার পেছনে কোন নারীঘটিত ব্যাপার জড়িত।

৫ ফেব্রুয়ারি, সংবাদ

তাহের হত্যাকাণ্ডের পেছনে ৩ কারণ : ক্যাম্পাসে গুঞ্জন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শেখ তাহের আহমেদকে পরিকল্পিতভাবেই হত্যা করা হয়েছে। কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড এবং কে এর পরিকল্পনাকারী তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে হত্যাকাণ্ডের পেছনে তিনটি কারণ আলোচিত হচ্ছে। এগুলো হল– বিভাগের এক শিক্ষক জানান, বিভাগের সিনিয়র

www.amarboi.org

শিক্ষক ও প্ল্যানিং কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন অধ্যাপক তাহের। গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত প্ল্যানিং কমিটির সভায় ড. তাহের ওই শিক্ষকের পদোন্নতির বিষয়ে জোরালোভাবে বিরোধিতা করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি প্ল্যানিং কমিটির সভায় যোগ দেয়ার জন্যই অধ্যাপক তাহের ঢাকা থেকে রাজশাহী আসেন; কিন্তু আগের রাতেই তিনি দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন। প্ল্যানিং কমিটির অন্য এক বিশেষজ্ঞ সদস্যকে সভার আগের দিন ওই প্রভাবশালী শিক্ষক বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেন বলেও প্রচার রয়েছে। বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জানতো না যে, ড. তাহেরকে হত্যা করা হয়েছে। তার অনুপস্থিতিতেই ড. মহীর পদোন্নতির আবেদন নাকচ হয়ে যায় বলে সূত্র জানায়। তবে কেউ কেউ বলছেন সামান্য পদোন্নতির বিষয়ে অধ্যাপক তাহেরকে খুন করা হবে- এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হত্যাকাণ্ডের পেছনে দ্বিতীয় কারণ হিসেবে আলেচিত হচ্ছে অধ্যাপক তাহেরের ফাঁকা বাসার দেখভালের দয়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত গার্ড জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের বাড়ি ডাঁশমারী এলাকায়। ধারণা করা হচ্ছে, জাহাঙ্গীর অধ্যাপক তাহেরের অনুপস্থিতিতে এই বাসায় কোন অপকর্ম বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাত, যা অধ্যাপক তাহের দেখে ফেলেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপককে খুন করা হয়।

5 February, The Observer

Caretaker admits his involvement in Prof Taher murder

Police unearthed some clues regarding the murder of Prof. Dr. S. Taher Ahmed from the interrogation of the arrested guard Jahangir.

During interrogation by police on Friday night Jahangir, caretaker of Professor Taher's house admitted his involvement in the planned murder of the teacher and also disclosed names of four persons. Based on the information given by Jahangir police arrested Nazmul, a welding worker from his Meherchondi residence adjacent to RU at dead of night on Friday and they were hunting for another three persons involved in the brutal murder. But police for the sake of the investigation did not disclose the names of the three persons.

২০ ফেব্রুয়ারি, নয়া দিগন্ত

অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই খুন!

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেন, শুরু থেকেই পুলিশ এই ঘটনাটিকে নিয়ে রহস্যজনক আচরণ করে আসছে। পুলিশ কী উদ্দেশ্যে এরূপ আচরণ করছে তা অনেকের

www.amarboi.org

কাছেই বোধগম্য নয়। এদিকে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তাহের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ব্যক্তিগত কারণে। বাসার কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীরসহ প্রভাবশালী একটি চক্রের অনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে ফেলায় এবং তার প্রতিবাদ করার কারণেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।

৫ ফেব্রুয়ারি, আমার দেশ

খুনের পেছনের কারণ কী?

আর্থিক কারণেই প্রফেসর তাহের খুন হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। বাসার গ্রেফতারকৃত কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীরকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে এরকম তথ্যই পেয়েছে পুলিশ। খুনিরা ছিল কমপক্ষে ৫ জন। পুলিশ অপর ৪ জনের নামও পেয়েছে। এদের মধ্যে শুক্রবার রাতে নাজমুল নামের আরো একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের মেহেরচন্ডী এলাকায়। পেশায় ওয়েল্ডিং মিস্ত্রী। অপর ৩ জনকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আর্থিক কারণে প্রফেসর ড. তাহের খুন হয়েছেন এমন অনুমান করেই পুলিশ তদন্ত কাজ শুরু করেছে। প্রফেসর ড. তাহেরের বাসা থেকে জব্দকৃত অগ্রণী ব্যাংক রাবি শাখায় পৃথক দুটি একাউন্টের চেক বইয়ের দুটি পাতা ছেড়া পাওয়া গেছে। পুলিশ ধারণা করছে বুধবার রাতে খুন করার আগে আততায়ীরা চেক বইয়ের ওই দুটি পাতায় মোটা অঙ্কের টাকা লিখে চেকে প্রফেসর ড. তাহেরের স্বাক্ষর নিয়েছে। বৃহস্পতিবার তারা ব্যাংক থেকে চেক দুটি ক্যাশ করেছে কিনা তা আজ খতিয়ে দেখবে। এর পাশাপাশি পুলিশ ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অভ্যন্তরীণ কোনো কোন্দলের জের ধরে প্রফেসর তাহের খুন হয়েছেন কিনা তাও খতিয়ে দেখছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ইনকিলাব

আমি নির্দোষ, আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে, কিছু স্বীকারের প্রশ্নই আসে না -আদালতে মহিউদ্দিন

আদালত প্রাঙ্গণে ড. মহিউদ্দিন নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, আমাকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অসুস্থ হওয়ার পরও রিমান্ডে নিয়ে আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি চিৎকার করে বলেন, আমি গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। গত কয়েকদিনে পুলিশ আমার কাছ থেকে কোন তথ্য বের করতে না পেরে পুনরায় রিমান্ডে নিচ্ছে। জোর করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণ করতে চাইছে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্লিজ আপনারা সত্য কথা লিখবেন। হত্যার দায় স্বীকার করেছেন মর্মে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট প্রসঙ্গে তিনি জানান, আমি পুলিশকে বলেছি এ হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাই কোন কিছু স্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। পদ্মার

www.amarboi.org

তীর হতে ড. তাহেরের এটিএম কার্ড উদ্ধার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব আমি দেখিয়ে দিইনি। কারণ, আমি তা লুকাইনি। জাহাঙ্গীর ও তার সহযোগীসহ আমাকে নিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়। এদিকে হত্যাকাণ্ডের সাথে শিবির সভাপতি সালেহী জড়িত বলে ড. মহিউদ্দিন স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন মর্মে পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

খুন-পরবর্তী ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

ড. তাহেরের লাশ উদ্ধারের পরপরই খুনিদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক, বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। ইসলামী ছাত্রশিবির এসব আন্দোলন-কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বরাবরই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিন্দা, প্রতিবাদ ও প্রকৃত দোষীদের বিচারের দাবি করে আসছে। রাবি শিবিরের সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীও উক্ত বিভাগের একজন ছাত্র হিসাবে শুরু থেকেই এই সব কর্মসূচির অগ্রভাগে থেকে খুনিদের গ্রেফতার ও ফাঁসির দাবিতে ছিলেন সোচ্চার। কিন্তু যারা এ হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে উদগ্রীব তারা শিবিরের ভূমিকায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ তৈরি করতে থাকে। ৩ ফেব্রুয়ারির এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর ৪, ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারির পত্রিকায় এ হত্যার মোটিভ এবং খুনিরা কেন কিভাবে প্রফেসর ড. এস তাহের আহমেদকে হত্যা করল তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয়। কিন্তু একটি কুচক্রীমহল হঠাৎ করেই এ হত্যাকাণ্ডের সাথে রাবি শিবির সভাপতি মাহবুবুল আলম সালেহীকে জড়িয়ে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এমনকি দৈনিক জনকণ্ঠ, সংবাদ, আমার দেশসহ বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয় যে, অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জের ধরে ছাত্রলীগের রাজশাহী মহানগরীর ২৯ নং ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে কার ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মাহবুবুল আলম সালেহীকে এই ঘটনার সাথে জড়ানো হলো ছাত্রসমাজসহ তা কারো বোধগম্য নয়।

পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'নারী কেলেঙ্কারী ঘটনায় ড. তাহের নিহত'। বেরিয়ে আসতে থাকে (জনকণ্ঠ, আমার দেশ, নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব) ঘটনার মূল রহস্য। তৎপর হয়ে ওঠে ঐ বিভাগের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক। কী তার পরিচয়? তিনি হলেন এক সময়ের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৈত্রীর অস্ত্রধারী ক্যাডার। কোর্ট এলাকায় তার বাড়ি। বর্তমানে ফজলে হোসেন বাদশার অন্যতম সহচর। তথ্যমতে ঐ শিক্ষকই ঐ রাত্রে নারী নিয়ে ড. তাহেরের বাড়িতে ফূর্তি

www.amarboi.org

করছিলেন। তিনি হলেন ভূ-তত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার তাপু। ঐ বিভাগে দীর্ঘ দিন থেকে কোন নিয়োগ দিতে দিচ্ছে না আওয়ামী বামপন্থী শিক্ষকরা। ফলে এই বিভাগে কোন প্রভাষক নেই। উল্লেখ্য যে, ভূ-তত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ২৪ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৫ জন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ড. তাহের ছিলেন জাতীয়তাবাদী ফোরাম রাবি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বিভাগের ১৬ জন শিক্ষকই ড. তাহেরের ছাত্র বিধায় আদর্শিক দূরত্ব থাকলেও ছাত্রশিক্ষক সুবাদে ড. তাপুরও ঐ বাসায় যাতায়াত ছিল। ঐ শিক্ষক নিজেকে আড়াল করার জন্যই ড. এস তাহের এর পরিবারের নিকট তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি শিক্ষক ড. মহিউদ্দিনকে হত্যাকারী বলে খবর দেয়। শুধু তাই নয় রাজশাহীর একটি পত্রিকার ব্যুরো চীফ যার নামের আদ্যক্ষর 'স' তিনিই এই ঘটনার সাথে সালেহীর নাম জড়ানোর মূল পরিকল্পনাকারী। আর শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে এতবড় মিথ্যাচার একা সামাল দিতে পারবেন না বলে রাজশাহী অঞ্চলের জোটের এক শীর্ষ নেতার পরামর্শও গ্রহণ করেন। এক সময় ঐ শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে এই সাংবাদিক দুর্নীতির ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশ শুরু করলে লেনদেনের ভিত্তিতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন থেকে ঐ সাংবাদিক শীর্ষ নেতার সাথে আদর্শিক বিরোধ থাকলেও পকেট সাংবাদিকে পরিণত হয়। সবার গ্রীন সিগনাল পেয়েই ড. তাপু থেকে মোটা অঙ্কের লেনদেনের মাধ্যমে নিউজ সিন্ডিকেট তৈরি করে সালেহীর নাম জড়িয়ে দেন। শিবির সভাপতি জড়িত বলে যে কারণগুলো উল্লেখ করেন তার সবই স্থূল। আমার দেশ, জনকণ্ঠ সিন্ডিকেট নিউজ করে "তাহলে কি সালেহীর ফার্স্টক্লাস পেতেই এই হত্যাকাণ্ড" অথচ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ড. তাহের ও ড. মহিউদ্দিনের নিকট সালেহীর কোন কোর্স ছিল না। অপরদিকে এটা কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না যে শিবির সভাপতি তার হাজার হাজার কর্মীবাহিনীকে বাদ দিয়ে ছাত্রলীগের সহযোগিতা নিয়ে ড. তাহেরকে হত্যা করতে পারে। পত্রিকায় এই বানোয়াট রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর রাজশাহীর শীর্ষ পুলিশ কর্তাও এটা লুফে নেন। তিনি অন্য আদর্শে বিশ্বাসী বলে এই মুহূর্তে প্রতিশোধ নিতে ছাড়লেন না। তাছাড়া রাজশাহী অঞ্চলে বিএনপি-জামায়াত অধ্যুষিত হওয়ায় দায়-দায়িত্ব জোট সরকারের কাঁধেই থাকবে এই ভেবেই তিনি পুলিশ রিমান্ডে জোর করে আসামীদের দিয়ে সালেহীর নাম বলার ব্যবস্থা করে পত্রিকাকে সত্যায়ন করেন। শুধু তাই নয়, পুলিশের কর্মকাণ্ডে প্রশ্ন সৃষ্টি হলে দাবি ওঠে ডিবিতে মামলা স্থানান্তরের। তখন ঐ কর্তা পুলিশের একজনকে ডিবিতে স্থানান্তর করে দায়িত্ব দেন। কিন্তু প্রকৃত অপরাধী ড. তাপুকে এখনও গ্রেফতার না করায় গোটা ঘটনাটি প্রশ্নবিদ্ধ।

www.amarboi.org

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের দাবির মুখে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। উপরন্তু পুলিশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করার মাধ্যমে কার হীনস্বার্থ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ছাত্রসমাজের কাছে এটিও এখন একটি বড় প্রশ্ন। গ্রেফতারকৃত খুনিদেরকে পুলিশ রিমান্ডের নামে তথাকথিত জবানবন্দী আদায়ের মাধ্যমে কারো কারো কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির নাম প্রকাশের চেষ্টা যেমন সকলের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চার করেছে, তেমনি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে এই ঘটনার বিচারকার্য সম্পর্কেও সকলকে করে তুলছে সন্দিহান।

ঘটনার রাজনৈতিক রূপ

ঘটনার পর খুনিদের শাস্তির দাবির মুখে পুলিশ যখন প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে গ্রেফতার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীরের স্বীকারোক্তির পথ ধরে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে ঠিক তখনই খুনিকে বাঁচানোর অপচেষ্টা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটনাটি রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত করে মূল হোতাদের রক্ষার জন্য গোয়েবলসীয় কায়দায় সক্রিয় হয়ে ওঠে একটি পরিকল্পিত নিউজ সিন্ডিকেট। গোয়েবলস বা গোয়েবলসীয় শব্দটি আমাদের দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ পরিচিত। অধিক মিথ্যাচার করলে এ শব্দটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়। মূলত গোয়েবলস জোসেফ ছিলেন হিটলারের অনুসারীদের অন্যতম। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। পরে বার্লিনের অন্যতম নাৎসি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন এবং নাৎসি সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মিথ্যা বারংবার কিংবা দশবার জোর দিয়ে বলতে পারলে তা সত্যতে রূপান্তরিত হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তিনি তার এই ধারণা অনুযায়ী জার্মান প্রচারযন্ত্রকে পরিচালিত করেন এবং বার্লিনের পতনের সময় হিটলারের এই বিশ্বস্ত সহচর তার সাথেই ছিলেন। গ্রেফতার এড়াতে তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। তার এই কৌশল থেকে এখনও মিথ্যাচারকে গোয়েবলসীয় প্রচার বলে আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিমা শক্তি তাদের অপছন্দের নেতাকে চারটি উপায়ে অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের এক নম্বর শত্রু হিসাবে তুলে ধরে; উপায় চারটি হলো: ১. Stage one is the crisis- সংকট সৃষ্টি করা, ২. Stage two is the demonization of the enemy leader- নেতাকে দানব হিসাবে তুলে ধরা, ৩. Stage three is the dehumanizing of the enemy as individual-ব্যক্তিগতভাবেও শত্রু

www.amarboi.org

মনুষ্যত্বহীন বলে প্রচার করা, ৪. Stage four is the atrocity stage- শত্রুর অত্যাচার ও নৃশংসতার গল্প তৈরি করা। ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগ পশ্চিমা অনুকরণে সংকট সৃষ্টির সকল Stage অতিক্রম করেছে। আর এ পথ ধরেই পরিকল্পিত উপায়ে পশ্চিমাদের মত সংকট সৃষ্টি করাই কি এর প্রকৃত উদ্দেশ্য? রাবি সভাপতিকে নিয়ে সেই কায়দা কানুনই চলছে বলে মনে হয়।

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ড. এস তাহের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ড. মহিউদ্দিন ঐ বিভাগের বিএনপিপন্থী শিক্ষক। কথায় বলে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। সে পথ ধরে আওয়ামী বাম শিক্ষকরা আন্দোলন করছে। তারা এই ঘটনাকে পুঁজি করতে সবচেয়ে বেশি তৎপর। ছাত্রলীগের আত্মস্বীকৃত একজন নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হত্যা করল আবার আন্দোলনও করছে তারা। কথায় বলে চোর এবং গৃহস্থ একজন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোট এবং জোটভুক্ত ছাত্রসংগঠনের আওয়ামীবিরোধী আন্দোলন করার বিরাট সুযোগ ছিল অথচ ঘটনা সবই বিপরীত। হায়রে নিয়তি! আর বেকায়দা ও দোষের ভার জোট সরকারের কাঁধে। উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করছেন এই ঘটনাকে যদি বাড়তে দেয়া হয় তাহলে জোটে এর প্রভাব পড়তে পারে। শিবির একটি আদর্শিক ছাত্রসংগঠন হওয়ার কারণে শিক্ষক হত্যার মত জঘন্য অভিযোগ কখনই তারা মেনে নেবে না। আবার পত্র-পত্রিকায় পরিকল্পিত রম্য-রচনার নায়ক তাপুকে কেন সরকার গ্রেফতার করছে না তাও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং উভয় সংকটের আশু উত্তরণ প্রয়োজন। বিশেষ করে এই মুহূর্তে পরিষ্কার যে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার কারণে ড. এস তাহেরকে হত্যা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ পুনঃতদন্তের মাধ্যমে শিক্ষক হত্যার মত গুরুত্বপূর্ণ এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আর সমস্যার সমাধানে জোটের শীর্ষ নেতৃত্বকে নজর দেয়া সময়ের অনিবার্য দাবি।

www.amarboi.org

পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের বিজয়, সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন দোসরদের উদ্বেগ

পাকিস্তানের নির্বাচন একটি আনন্দঘন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শুধু শেষই হয়নি, বরং সেখানকারর জনগণ সামরিক জান্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে যখন দেখলাম "পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের উত্থান বিবেচনায় রাখতে হবে" ভাবলাম সে দেশের মানুষের মধ্যে যেখানে কোনো উৎকণ্ঠা নেই বরং তারা স্বতস্ফুর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে স্ব-স্ব দলকে বিজয়ী করেছে, সেখানে আমাদের দেশের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উত্থান, সজাগ এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন। প্রশ্ন জাগে-কাকে সজাগ থাকতে হবে? কেনো সজাগ থাকতে হবে? কি জন্য সজাগ থাকতে হবে? কারণ একটি জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় মানে Think of Nation, Jist of Paper. Gidence of Nation বলা যায়। কিন্তু তা না হয়ে জাতীয় শব্দ থেকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। এ জাতীয় কথা শুধু তারাই লিখেন ও বলেন যারা স্বভাবত ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয় সহ্য করতে পারেন না। অথচ পাকিস্তানের জগগণ স্বতস্ফুর্তভাবে মুশাররফ সমর্থনপুষ্ঠ মুসলিম লীগকে ৭৭টি আসনে, বেনজীর ভুট্টোর পিপলস পার্টিকে ৫২টি আসনে, জামায়াতে ইসলামী পন্থীদের (এমএমএ) ৪৯টি আসনে এবং অন্যান্যদের ৫১টি আসনে বিজয়ী করল। ৪৯টি আসনে ইসলামী জোটের বিজয় কোনো পাগল, অচেতন, লোকের ভোটে হয়নি বরং সচেতন জনগণই তাদের আকণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। সেখানে আমাদের দেশের কতিপয় পত্র-পত্রিকা সে ক্ষেত্রে আদাজল খাওয়ার কি আছে? বরং জনমত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামরিক শাসন থেকে মুক্ত করেছে। তাহলে কি আমরা বলব, গণতন্ত্রকে নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে স্বীকার করতে চান না, আদর্শ চিন্তার বাইরে গেলে বিশ্বাস করতে চান না, বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যখন ইসলামপন্থীদের বিজয় সূচীত হয় তখন বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক ভাষা ও মন্তব্য প্রদান করা তাদের স্বভাব যা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচায়ক নয়। পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকা যখন কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করছে না তখন আমরা কেনো ইসলামপন্থীদের বিজয়ে এত উদ্বেগ ও অস্থির হয়ে পড়লাম?

আসলে তাদের মূল টার্গেট কোনো ব্যক্তি বা দল নয় বরং মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম। এজন্য আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "হে রাসূল, আমার জানা আছে তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না বরং জালেমরা আল্লাহর নির্দেশনাবলীকে অস্বীকার করে।"

www.amarboi.org

পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের বিজয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন দোসররা এখন সজাগ ও সচেতন। এটিকে তারা বিবেচনায় রাখার কথা বলেছেন। সেই একই দোসররা বিগত ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পূর্বে এদেশের মানুষকে ইসলামের বিপক্ষে প্রকাশ্য আহবান জানিয়েছিল। তাদের পত্রিকায় জামায়াত ও ইসলামী দলগুলোর আসন ছিল শূন্য। আর জামায়াত আজ সরকারের অংশীদার। নির্যাতনের পূর্বে এদেশের অনেক বাম বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন ও লিখেছেন স্বাধীনতা বিরোধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা উড়লে আমরা আত্মহত্যা করব, দেশত্যাগ করব, কিন্তু কেউ তো আত্মহত্যা করেননি? দেশত্যাগ করেননি?

এদেশের মানুষ যেমন আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি, সন্ত্রাস-দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায় দিতে গিয়ে চারদলীয় জোটকে সমর্থন করেছে, ঠিক তেমনি পাকিস্তানের মানুষ কাশ্মীর প্রশ্নে মুশাররফের মার্কিন তোষণ নীতি ভালো চোখে দেখেনি। বরং এই নীতিতে মুশাররফের আধুনিক পাকিস্তান উপহারের প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক মানুষ এখনো দেশের প্রতি ভালবাসা এবং কাশ্মীর প্রশ্নে ছাড় নিতে রাজি নয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন পারভেজ মুশাররফ আমেরিকার তথাকথিত "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এবং ইসলামের উপর খড়গহস্ত সে দেশের ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীর হৃদয়ে ব্যাপক রেখাপাত সৃষ্টি করেছে। আর তাই এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ তার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

বিশ্বের মিডিয়াগুলো এবং আমাদের দেশের বাম বুদ্ধিজীবীরা যখন ইসলাম তথা মৌলবাদীদের উত্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সেখানে পারভেজ মুশাররফ দিয়েছেন পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের সমন্বয়ে শক্তিশালী সরকার ঘোষণা। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামপন্থীদের এই বিজয় পাকিস্তান সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। একথা ঠিক যে পাকিস্তান আজ বিশ্বের বুকে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী একটি দেশ। এটিকে আমেরিকা যেমনি মাথায় নিয়েছে ভারতও তেমনি অবজারভেশনে রাখছে। কাশ্মীর পশ্নে পাকিস্তান ভারত দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ আর ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামপন্থীদের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে বিশ্বের মোড়ল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসররা এন্টি-ইসলাম মিডিয়া সিএনএন, বিবিসি, ভোয়া কেউই সহ্য করতে পারছে না। এটা আজ পরিষ্কার পাকিস্তানের সরকার গঠনে ইসলামপন্থীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান হতে যাচ্ছে। এ কথাও ঠিক যে, আমাদের দেশে মতিউর রহমান সাহেবরা ৯০% মুসলমানের দেশে বসে পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের উত্থানে যতটুকু কষ্ট পেয়েছেন এর বিপরীতে হাজারো গুণ আনন্দিত হওয়ার শোকও দেশে আছে। তারা কি তা মনে করেন না? বুঝেন না, না বুঝতে চান না?

www.amarboi.org

নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তিনটি রায় ঘোষিত হয়েছে।

১. তারা পাকিস্তানের এক ইঞ্চি ভূ-খণ্ডেও মার্কিনীসহ কোনো বিদেশী সৈন্যের অবস্থান বরদাশত করবে না।

২. মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে তুষ্ট করার জন্য কাশ্মীর নীতিকে তারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাকিস্তানে ইসলামী ও ধর্মীয় শক্তিসমূহ এবং মাদ্‌রাসাসহ ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর জেনারেল পারভেজ মুশাররফের ক্র্যাকডাউনকে তারা নাকচ করে দিয়েছে। পাশাপাশি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের মডেলে ইসলামের মৌলিক বিধানকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের ইঙ্গ-মার্কিনী ধাচের ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানির অপচেষ্টাকে তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, বিগত আওয়ামী আমলে বাংলাদেশে ইসলাম, আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদ্‌রাসা ও ইসলামী মূল্যবোধের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে তার ফলশ্রুতিতে ইসলামপন্থী সকল দলগুলো একই প্লাটফর্মে এসে জোটবদ্ধ হয়েছে। ঠিক তেমনি গত দু'বছর আগে ইসলামের বৃহৎ স্বার্থে এবং ইসলামবিরোধী শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য তাদের সঙ্কীর্ণ পদ্ধতিগত মতভেদ বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তান একটি বৃহত্তম ঐক্যজোটে মিলিত হয়। আর এ জোটের নামকরণ করা হয় মোত্তাহেদা মজলিসে আমল (এমএমএ)। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশ। আর এ দেশের মোত্তাহেদা মজলিস নামক ইসলামী ঐক্যজোট ৪৬ আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। আশা করা যায় এ দেশে তারা সরকার গঠন করবে। বেলুচিস্তানেও ইসলামী ঐক্যজোট মোত্তাহেদা মজলিস ১৩টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। আমেরিকা এবং পরোক্ষভাবে ভারতকে খুশি করার জন্য ইসলামী শক্তিসমূহকে কঠোরভাবে দমন করার মানসে তাদের ওপরে নানা রকম জুলুম, নির্যাতন চালিয়েছেন। ঐদিকে তিনি কাশ্মীরের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা প্রদান শুধু বন্ধই করেননি বরং তাদেরকে স্যাবউইচ করার চেষ্টা করেছেন। প্রেসিডেন্ট মুশাররফ মার্কিন বাহিনীকে নামে পাক-আফগান সীমান্তে ৫০ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেছেন। এর কোনো কিছুকেই পাকিস্তানের জনগণ সুনজের দেখেনি। সুতরাং বলা যায় আজকের নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের বিজয়ে বিশ্বের কারোরই উদ্বেগের কারণ হওয়া ঠিক নয়। এটি হচ্ছে পাকিস্তানের ইসলামপ্রিয় জনগণের কষ্টার্জিত ফলাফল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে সময়ে গোটা বিশ্বকে আঙুলের ইশারায় পরিচালনার জন্য মাতাল ঠিক সে মুহূর্তে পারমাণবিক শক্তির দেশ পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের বিজয়ে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীরা আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। এজন্য ইসলামপন্থীদের আগামী দিনের চলার পথে তাদেরকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাক এবং সচেতন হতে হবে।

www.amarboi.org

সেনা অভিযান : গরম ভাতে বিড়াল বেজার

চারদলীয় জোট সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সন্ত্রাস নির্মুল ও দুর্নীতি দমন। ১০ অক্টোবর জোট সরকারের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া টেলিভিশন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেমনি জোট সরকারের সাফল্যগুলো উল্লেখ করেছেন, তেমনি সন্ত্রাস দমন প্রশ্নে আরো সময় চেয়েছেন। এতে জাতি হতবাক হয়নি বরং আশ্বস্ত হয়েছে। আর সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এক সপ্তাহের ব্যবধানে সন্ত্রাস নির্মুলে দেশব্যাপী ক্লিনহার্ট অপারেশনকে দেশবাসী সাধুবাদ জানিয়েছে, জনমনে স্বস্তি এসেছে। অনেককে এও বলতে শুনেছি, এবার সন্ত্রাস নির্মুল হলেও হতে পারে। কারণ প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে নিজ দলের লোকদেরকেই বেশি সতর্ক করে আসছেন। এমনকি সেনা অভিযানে সারা দেশে গ্রেফতারকৃত লোকের মধ্যে নিজের দলের নেতাকর্মীরাই বেশি। এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। গ্রামে বলে "ঝিকে মেরে বউকে শিখানো"। প্রধানমন্ত্রীর এই নীতিতে নিঃসন্দেহে আওয়ামী সন্ত্রাসী গডফাদাররা বুঝতে পেরেছেন তাদেরও রেহাই নেই। ইতিমধ্যে অনেকেই তা উপলব্ধি করে সরে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। এই আশঙ্কা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রতি বিমানবন্দর থেকে কুখ্যাত সন্ত্রাসী কালা ফারুকের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। সে নিজেকে হাজী আব্দুল রশিদ পরিচয় দিয়ে শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে পলায়ন করছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কোনো জিজ্ঞাসাবাদের আগেই পুলিশের গুলিতে নিহত হলো কালা ফারুক। জানা যায়নি তার নিকট থেকে সন্ত্রাসের উৎস ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের অজানা কাহিনী। তার মৃত্যুর ঘটনায় বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কে মারলো? কেনই বা মারলো? তার এই রহস্যাবৃত হত্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে কি? তার সাথে যে শিল্পীরা ছিল তাদের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের বিরাট নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন যথার্থ উদ্যোগের। আর সন্ত্রাসীরা যাতে পলায়ন করতে না পারে সেজন্য সরকারকে সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া পাহাড়া এবং বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন সেলসহ সকল যাতায়াতের মাধ্যমগুলোর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

গ্রামে বলে "চোরের মন পুলিশ পুলিশ"। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরাবরই সেনা মোতায়েনের বিপক্ষে অবস্থান নেন। জাতির কাছে এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন, এর কারণ প্রত্যেক মানুষই জনসম্মুখে নিজেকে যতই নিরাপরাধ মনে করুক না কেন নিজের কাছে তার অপরাধ পরিষ্কার। নিজের আয়নায় দোষ ধরা পড়ে বলেই ১ অক্টোবরের পূর্বে 'কেয়ারটেকার' প্রিয়ডে দেশব্যাপী সেনা মোতায়েনে তিনি সবচেয়ে বেশি বিরোধীতা করেছেন। ইতিপূর্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

www.amarboi.org

সেনাবাহিনীকে ট্রাফিকের কাজে ব্যবহার করে তাদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছেন অথচ আজ যখন নিজ দলের বড় বড় সন্ত্রাসী ও গডফাদার-আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, সাবের হোসেন চৌধুরী ও হাজী সেলিম ধরা পড়েছে তখন তিনি হরতালের ডাক দিয়েছেন। অথচ এর আগের দিন তিনি বলেছেন, সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষ সাংবিধানিক পদমর্যাদা নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেয়া হোক। কিন্তু যে মুহূর্তে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারি দলের বেশি লোক গ্রেফতার করেছে, এর মধ্যে আহত-নিহতের সংখ্যাও কম নয়, ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ হাসিনা হরতালের ডাক দিয়ে সন্ত্রাসীদের উৎসাহ প্রদান করেছেন যা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

বিগত নির্বাচনের সময় একটি সদ্য বিদায়ী সরকার হিসেবে তারই সেনা মোতায়েনকে সবার আগে সাধুবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করে অপকর্মের কথা স্মরণ করেই তিনি তার বিরোধীতা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন সেনা মোতায়েনের মধ্য দিয়ে যদি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। "ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়"। সুতরাং শেখ হাসিনা জানেন, পহেলা অক্টোবরে সেনাবাহিনী নামানোর কারণে তার পরাজয় হয়েছে। আওয়ামী লীগ সংসদ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করার যে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল তা ভেস্তে যাওয়ার অন্যতম দুটি কারণ– এক. কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের প্রশাসনে আওয়ামী শুদ্ধি অভিযান, দুই. সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা। সকল জাতীয় পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী যখন দেশব্যাপী সন্ত্রাস নির্মূলের এই সেনা অভিযানকে দেশবাসী অভিনন্দন জানিয়েছে, তখন শেখ হাসিনা পাগলের মত প্রলাপ করেছেন। তিনি বলেছেন, জোট সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়ে সেনাবাহিনী নামিয়েছে। আবার কখনো বলেছেন, বিরোধীদলকে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমনের নামে সেনা নামিয়েছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা বলেছেন, সেনা সদস্যদের হাতে বেশি পরিমাণ বিএনপি'র নেতা-কর্মী গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, দেশে সন্ত্রাসী ঘটনাবলির জন্য বিএনপি'ই দায়ী। কিন্তু শেখ হাসিনা ও তার দলের এই দু'মুখো বক্তব্য কেন? তারা কি চিন্তা করছেন না সেনা অভিযানে বিরোধীদলের তুলনায় সরকারের দলের লোকেরাই বেশি অসহায়? বিরোধীদলে থাকতে তারা আওয়ামী সন্ত্রাসী ও পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছে। এখন সরকারি দলে থাকায় মার খেয়েও হজম করতে হচ্ছে অথচ আওয়ামী লীগ সেনা অভিযানে তাদের দলের লোক গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, হরতাল ডাকছে, দলের

www.amarboi.org

শীর্ষ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এখন আবার শেখ হাসিনা বলছেন- দেশে সংসদীয় মার্শাল চলছে। তার এই চতুর্মুখী বক্তব্য দেখে মনে পড়ছে, বছর কয়েক আগে একজন কলামিস্ট-এর লেখায় পড়লাম, তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি আজও তার চৌহদ্দী নির্মাণ করতে পারলাম না। কারণ তিনি একজন বহুরূপী মানুষ।" সুতরাং শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, বর্তমান সময়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি নাগরিক যখন সন্ত্রাসের কবলে আক্রান্ত তখন সে মানুষগুলোকে বাঁচাতে এদেশের মানুষের পরম বন্ধু, দেশরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ও নিরাপত্তায় ছায়াদানকারী সেনাবাহিনী এগিয়ে আসবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু যারা আজকে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করছেন তারা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত নয় বরং এ দেশেরই সন্তান তারা। এ দেশের মানুষের কষ্টার্জিত রাজস্ব আয়ের যেমনি বিরাট অংশ সেনাবহিনীর জন্য খরচ হয় তেমনি সবচেয়ে মরণব্যাধী সন্ত্রাসের কবল থেকে বাঁচাতে তাদের সাহায্য অনিবার্য। ছিঃ ছিঃ শেখ হাসিনা আপনি জাতির মৌলিক অধিকার জানমালের নিরাপত্তায় সরকারের এই সেনা অভিযানেও একমত হতে পারলেন না? আপনি কি পারতেন ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নিজদলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে? আপনি কি পেরেছেন কোন এমপি গডফাদার গ্রেফতার করতে? আর সে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে অন্যের সমালোচনা করা সত্যিই আপনার মুখে বেমানান! জোট সরকারের এ অভিযান জাতির কাছে খুবই প্রশংসিত। যদি প্রকৃত সন্ত্রাসীরা গ্রেফতার না হয় এবং সেনা অভিযান প্রত্যাহার করা হলে সন্ত্রাসীরা আরো দ্বিগুণ হারে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হবে। যার পরিণাম হবে "ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ার মত।"

এবার প্রধানমন্ত্রীকে এই যুগোপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ পালনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের বিষদাঁত ভাঙতেই হবে তা যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন? পাশাপাশি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা যদি আইনের মাধ্যমে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে কোনো সন্ত্রাসী ও গডফাদার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমাদের দেশে কারাবরণ মানেই একটি পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার। যিনি যত বেশি কারাবরণকারী তিনি ততো বড় নেতা। কিন্তু এর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বরং খালেদা জিয়া এবার যদি এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, করামুক্তির পর ফুলের মালার পরিবর্তে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে তাহলে এমপি, ওয়ার্ড কমিশনারদের গ্রেফতার করা প্রয়োজন হবে না। এটি মনে রাখতে হবে যে, একটি

www.amarboi.org

দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মান- মর্যাদার সাথে সে দেশের সরকারের ভাবমূর্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং আজও এদেশের মানুষ সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। আর সন্ত্রাস নির্মূলে তাদেরও যথার্থভাবে পরিচালনা করতে না পারলে তারা যেমনি সাধারণ মানুষের কাছে নিন্দিত হবে, তেমনি দেশ এবং জাতির কাছে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও সর্বস্তরের মানুষের অনুভূতি এটাই প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর ক্লিনহার্ট অভিযান অনেকটাই সফল হয়েছে। ১৯৭৪ সালের পর বলা যায়, এটাই সফল সেনা অভিযান। কিন্তু এই অভিযানে এ পর্যন্ত কিছু লোক নিহত হয়েছে তা যেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত তেমনি যে পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা যদি পুলিশ বাহিনী দিয়ে করা হতো তাহলে এর থেকে অনেক বেশি জান-মালের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পাশাপাশি সেনা অভিযান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা মনে রাখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটে সৃষ্ট ধোঁয়াটে পরিস্থিতির জন্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রক্রিয়াগত জটিলতাই অন্যতম দায়ী। আর এই সুযোগকে লুফে নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী হরতাল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সেন্সিটিভ এরিয়া। এখানে মুহূর্তের মধ্যে বিরাট সংঘাত-সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু গভীর রাতে দেশব্যাপী সেনা অভিযানের অংশ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে হলে ঘুমন্ত ছাত্রদের গ্রেফতার, হয়রানী, কক্ষ তছনছ, শিক্ষকের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার অভিযোগ উঠেছে। সাথে সাথে অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী আমলে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের ঠেঙানোর জন্য যে তালিকা তৈরি করেছিল সে তালিকা অনুযায়ী গ্রেফতার ও পুরাতন ছাত্রনেতাদের খোঁজাখুজি, জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনা অভিযানের এই প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও সাধারণ ছাত্রদের হয়রানি এড়াতে অভিযানের পূর্বেই সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ ও অছাত্র সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে সরকার যদি এই অভিযান চালাতেন, তাহলে একদিকে সাধারণ ছাত্ররা যেমন হয়রানির শিকার হত না, তেমনি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গণ গড়তে এ অভিযানও পজেটিভ ভূমিকা রাখত। কিন্তু তা না হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অভিযান ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সর্বোপরি ক্যাম্পাসে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই জন্য সেনাবাহিনীকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে ভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃত সন্ত্রাসী গ্রেফতারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

www.amarboi.org

সেনাবাহিনী হচ্ছে নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের বন্ধু, তাই সেনাবাহিনীকে অবশ্যই তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। যাতে নিরপরাধ মানুষ ও ছাত্রদের সাথে আচরণে সন্ত্রাসীদের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সৃষ্টি না হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই কৃতিত্বপূর্ণ যুগোপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপকে অন্যখাতে প্রবাহিত করার জন্য যেমনি সরকারি দলের একটা অংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করছে, তেমনি বিরোধীদলের বিরোধীতা, কতিপয় বাম পত্র-পত্রিকায় "এন্টি গভমেন্ট নিউজ" চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এসকল ষড়যন্ত্র সমালোচনা করার মত ইস্যু যাতে তারা খুঁজে না পায় সে দিকেও সরকারকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি যারা নিরপরাধ তাদের দ্রুত ছাড়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং সেনা সদস্যদের প্রতি এদেশের মানুষের যে সম্মানবোধ ও উচ্চাশা রয়েছে তা রক্ষা করতে প্রয়োজন সন্ত্রাসী এবং সাধারণ মানুষের সাথে আচরণগত ব্যবধান। তবেই চারদলীয় জোটের অন্যতম প্রতিশ্রুতি সন্ত্রাস নির্মুলের এই অভিযান সফল হবে। মানুষ পাবে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা। আমাদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে দুটি মৌলিক সমস্যা– সন্ত্রাস ও দুর্নীতি। বিগত সরকারের আমলে সন্ত্রাস যেমনি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, তেমনি দুর্নীতিতে পেয়েছে চ্যাম্পিয়নশীপ। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, দুর্নীতি দমনে কি ধরনের উদ্যোগ নেবেন সেই দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে দেশবাসী। এটা সত্য যে, দুর্নীতি আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সরকার সেনাবাহিনী দিয়ে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা যত সহজ তার থেকে অনেক বেশি কঠিন দুর্নীতি দমনের উদ্যোগ নেয়া। কারণ দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত তারা অধিকাংশই রাষ্ট্রীয় আমলা, মন্ত্রী, এমপি, সমাজের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা। তাই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সেকেন্ড স্টেপ কী দুর্নীতি দমনের কর্মসূচি হবে? আর তাহলে দেশবাসী অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করবে, ধন্যবাদ সেনাবাহিনী, সাবাস! সাবাস! প্রধানমন্ত্রী।

www.amarboi.org

আওয়ামী লীগের ভারতপ্রীতি ও ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকা

দেশের খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, বাংলাদেশে ভারতের প্রথম ডেপুটি হাইকমিশনার এবং পরবর্তী সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জে.এম. দিক্ষিত বছর তিনেক আগে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে (Liberation and beyond Dhaka UPL 1999) শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্র চিত্রনের জন্য Person of Sheikh Mujibur Rahman শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের বিশ্বাসের অভাবই প্রকৃতভাবে দায়ী। (Because of Mujib's own lack of convection about transforming his country into a genuine secular democracy) ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব যখন ইসলামী সঙ্গীত শীর্ষক সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য তাদের দু'টি শর্ত পালন করতে হয়েছে। এক- তাদের ভারত থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। দুই- তাদের বাংলাদেশের ইসলামী স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে হয়েছে। (Whose over came to power in Bangladesh had to fullfill two stipulations for Serviving in power. first- that he of she should maintain a certain amount of distance from India and Second the person should confirm the islamic identity of Bangladesh.) শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্যেই বাংলাদেশের ইসলামী ভাবধারা ও ঐতিহ্য যে অপরিহার্য তাই নয় শেষ মুজিবুর রহমান ইসলামী ঐতিহ্যকে মূলধন করে রাজনীতির প্রথম পাঠ শুরু করেন। কিন্তু এই নীতির উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে তিনি যেমনি তার চেলা-চামুণ্ডাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তেমনি পরবর্তীতেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করে একই মেরুতে অবস্থান নিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কার্যকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৯০% মুসলমানের দেশে ইসলামী মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতিতে তারা আঘাত হেনেছে সবচেয়ে বেশি। আলেম ওলামাদের উপর হামলা, নির্যাতন, মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ, পবিত্র কুরআনের অবমাননা, ইসলামী শিক্ষা সঙ্কোচনের মত অনেক ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনদিক থেকে বেষ্টিত ভারত-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সীমানার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি। এই রাহুর কবলে রক্তাক্ত হয়েছে

www.amarboi.org

বিশাল জনপদ, হারিয়েছি আমরা অনেক সম্পদ। আর আওয়ামী লীগ কর্তৃক ভারতের দাদাবাবুদের আশীর্বাদ নিয়ে দেশ পরিচালনার হীন চক্রান্তকে এই দেশবাসী কখনো গ্রহণ করতে পারেনি।

আল্লাহ, রাসূল (সা) সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য, কুরআন অবমাননা, মসজিদে হামলা ও দখল:

- রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় আহুত ইমাম সম্মেলনে ২৬ এপ্রিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ইমামদের সার্টিফিকেট বিতরণকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ১৩টি আচরণবিধির ১টিতে 'আলাহু আকবর' ধ্বনি দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। (৪ মে ১৯৯৯, সংগ্রাম)

- আওয়ামী সরকারের আমলে মূর্তির (স্বরস্বতী দেবী) পায়ের নীচে কুরআনের আয়াত ছাপানো হয়েছে। ইসলামী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হিন্দুদের 'বাণী অর্চনা' অনুষ্ঠানের দাওয়াত কার্ডে স্বরস্বতীর পায়ের নীচে কুরআনের আয়াত ছাপায়। (১৬ জানুয়ারি ১৯৯৯, সংগ্রাম)

- বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? ক) আল্লাহ, খ) রাসূল, গ) ফেরেশতা, ঘ) বঙ্গবন্ধু। ময়মনসিংহের মুকুল বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ১৯৯৬ এর নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্মের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটি করা হয়। (১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইনকিলাব)

- মুসলিম জাতির পিতা কে? ক) শেখ মুজিবুর রহমান, খ) ওমর (রা), গ) ইব্রাহীম (আ), ঘ) নূহ (আ)। এমনি একটি প্রশ্ন করা হয় ময়মনসিংহের আরেকটি স্কুলে। (২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইনকিলাব)

- আওয়ামী সরকারের আমলে বিভিন্ন স্থানে কুরআন শরীফ নর্দমায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২ জুন ১৯৯৯ মিরপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০০, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাজশাহীতে উলেখযোগ্য। (বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট)

- ১৪ জুলাই ২০০০ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মহানগর সার্বজনীন পূঁজাকমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা অবিলম্বে সংবিধান থেকে 'বিসমিলাহ' বাতিল করার দাবি জানান।

- ১০ জুন ২০০০ আওয়ামী লীগ সমর্থিত একদল মুসলিম নামধারী ভণ্ড বায়তুল মোকাররম মসজিদের মেহরাবে একজন মসুলীকে মেরে রক্তাক্ত করে। (১১ জুন ২০০০, সংবাদ/প্রথম আলো)

www.amarboi.org

- ৬ এপ্রিল ২০০১ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইট থেকে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করার চেষ্টা করলে পুলিশ মিছিলের ব্যানার কেড়ে নেয় এবং টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এর পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, গুলি এবং বুট জুতা পায়ে শত শত পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করে জাতীয় মসজিদের পবিত্রতা ভূলুণ্ঠিত করে। গোয়েন্দা পুলিশ লাঠি, হকিস্টিক, রড দিয়ে জামায়াত-শিবির কর্মী ও নিরীহ মুসলিদের মারধর করে রক্তাক্ত করে এবং কয়েকশত মুসলিকে গ্রেফতার করে। এমনকি ডিবি পুলিশের একটি গ্রুপ খতিব ওবায়দুল হকের রুমের দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলে। (৭ এপ্রিল ২০০১, ইনকিলাব/সংগ্রাম/মানবজমিন/যুগান্তর)

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নির্মিতব্য একটি আবাসিক হলের ডিজাইন থেকে মসজিদ বাদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ শত মুসলিম ছাত্রের জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে অমর একুশে নামে এই হলটি নির্মাণ করা হয়েছে। কার্জন হল সংলগ্ন পুরাতন জাদুঘরের পাশে নির্মিতব্য এই হলে মূল ডিজাইনার প্রকৌশলী নিশ্চিত করে বলেন, নতুন হলটির ডিজাইনে কোনো মসজিদ নেই। (৬ নভেম্বর ১৯৯৯, ইনকিলাব)

- ৬ জুন ২০০০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী ঘরানার সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা মুসলমানদের নামে আগে 'মোহাম্মদ' ও 'আলহাজ্জ্ব' বাদ দেয়ার দাবি জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতা সি আর দত্ত, সুধাংশ শেখর হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। (৭ জুন ২০০০, যুগান্তর/ইনকিলাব)

- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আলী আজগর হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সন্ত্রাসী (নাউযুবিলাহ) হিসেবে আখ্যায়িত করে। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এএইচএসকে সাদেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলেও কোনো প্রতিবাদ করেননি। (সংবাদ ভাষ্য)

- এ সরকার ক্ষমতায় এসেই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করে। এমনকি শুক্রবার জুমার নামাজে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে মুসলিদের প্রবেশ করানো হয়। (সংবাদপত্রের রিপোর্ট)

আলেম-ওলামা নির্যাতন, মাদ্রাসা বন্ধকরণ, ফতোয়া নিষিদ্ধকরণ ও ইসলামী কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

www.amarboi.org

- আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রায় ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়। উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক হিস্ট্রি, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় নতুন করে অনুমোদন প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। এসব বিষয়ে নতুন করে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ৬ জুলাই ১৯৯৯ দেশে ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধের প্রতিবাদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় সংসদে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। (২৭ আগস্ট ১৯৯৯, ৭ জুলাই ১৯৯৯, দিনকাল)

- আওয়ামী সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ড যেমন যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে হত্যাকাণ্ড (৬ মার্চ ১৯৯৯) কবি শামসুর রাহমানকে কথিত হত্যা প্রচেষ্টা (২ জানুয়ারি ১৯৯৯) কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ড (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), সাংবাদিক শামসুর রহমান হত্যাকাণ্ড (১৬ জুলাই ২০০০), সিপিবি'র মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (২০ জানুয়ারি ২০০০), ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (১৪ এপ্রিল ২০০১) প্রভৃতিতে আলেম ওলামাদের জড়িয়ে শতশত আলেম ওলামা ও ইসলামপন্থীদের গ্রেফতার করেছে। এ পর্যন্ত সরকার ৩০ হাজার আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা মামলা দায়ের করেছে। অথচ ঘটনার কোনটিতেই আলেম ওলামা বা ইসলামপন্থীরা জড়িত প্রমাণিত হয়নি। (২৫ মার্চ ২০০১, দিনকাল)

- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ মোহাম্মদপুরের একটি মসজিদে কথিত পুলিশ হত্যার অভিযোগে প্রখ্যাত আলেম ইসলামী ঐক্যজোটের শীর্ষ নেতা শায়খুল হাদিস আলামা আজিজুল হক ও মুফতি আমিনীকে গ্রেফতার করা হয়। (৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১, ইনকিলাব/যুগান্তর)

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগে মেধাবী মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আওয়ামী সরকার। বাংলা, আইন, সমাজবিজ্ঞান, ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৩০ মে ১৯৯৯, ইনকিলাব/সংগ্রাম)

- চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়াই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও তাফসীর বন্ধ করে দেয়া হয়। (৯ অক্টোবর ১৯৯৬, ইনকিলাব)

- আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হলেও পেটোয়া বাহিনী দিয়ে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ওয়াজ মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি করতে বড়ই পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর ১১ নভেম্বর ২০০০ চট্টগ্রাম ও ১৩ ফেব্রুয়ারি

www.amarboi.org

২০০১ ফরিদপুরের তাফসীর মাহফিল নিষিদ্ধ উলেখযোগ্য। (১২ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১, মানবজমিন)

- পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে (সেখানে মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ) রমজানের সময়ই নীলফামারীতে মাইক ব্যবহার করে রোযাদারদের ডাকানো নিষিদ্ধ করা হয়। নীলফামারী জেলা প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। (২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯, সংগ্রাম)

- চট্টগ্রামে ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফিল বন্ধের ষড়যন্ত্র করে সরকার। এর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১০ নভেম্বর শুক্রবার মুসলিরা এর প্রতিবাদে বিভিন্ন মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ বুট-জুতা পরে চট্টগ্রামের প্রধান মসজিদ আন্দরকিলা শাহী মসজিদে প্রবেশ করে বহু নিরীহ মুসলিকে গ্রেফতার করে। (১১ নভেম্বর ২০০০, যুগান্তর/ ইত্তেফাক)

- ২৭ মার্চ ২০০১ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপেদেষ্টা ডাক্তার এস.এ. মালেক সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালিমন্দির ও আনন্দময়ী আশ্রম নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতা শ্রী শুধাংশু শেখর হালদার হুঙ্কার দিয়ে বলেন, ফতোয়াবাজদের (ইসলামপন্থীদের) আমরা সাগরে ডুবিয়ে মারবই। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে কালিমাতা জাগবে না। (২৮ মার্চ ২০০১, যুগান্তর/ইনকিলাব)

- ৫ এপ্রিল ২০০১ রাত প্রায় সোয়া ১২টার দিকে গোয়েন্দা পুলিশ বিনা কারণে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনালের আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন বিশেষ ক্ষমতা আইনে একমাসের আটকাদেশ দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ করে এবং জেলখানায় ডিভিশন না দিয়ে সাধারণ কয়েদীদের সাথে থাকতে দেয়া হয়। (৬, ৭ এপ্রিল ২০০১, প্রথম আলো/ইনকিলাব/সংগ্রাম)

- আওয়ামী সরকার অন্যায়ভাবে দেশবরেণ্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম-এ দ্বীন মাওলানা ওয়াবদুল হককে বায়তুল মোকাররমের জাতীয় মসজিদের খতিব পদ থেকে অব্যাহতি দেয় ২২ এপ্রিল ২০০১। তার অব্যাহতি পত্রে বলা হয় বয়স ৭৩ বছর তাই তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্বের সকল খতিবই আমৃত্যু স্বপদে বহাল ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত খতিবকে কাদিয়ানী সমর্থক মাওলানা (?) আব্দুল আওয়াল এর স্বাক্ষরে অব্যাহতি

www.amarboi.org

দেওয়া হয়। পরে জনতার দাবিতে এবং আদালতের রায়ে সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং তিনি স্বপদে ফিরে আসেন। (২৩ এপ্রিল ২০০১, সংগ্রাম/যুগান্তর)

ভারতীয় আগ্রাসন ও সীমান্ত মামলা

- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ তালপট্টি দখলের পর ভারত শেখ মুজিবের শাসনামলেই ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তির বদৌলতে বাংলাদেশের বিশাল ছিটমহল 'বেরুবাড়ীর' দখল চিরতরে লাভ করে। এর পর থেকেই ভারত একের পর এক প্রায় ৩০ হাজার একর জমি কৌশলে অথবা জোর করে দখল করে। অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভারত মাত্র ক'দিন আগে বাংলাদেশের পঞ্চগড় সীমান্তে ২৮২টি সীমানা-নির্দেশক পিলার উৎপাটন করে, তেঁতুলিয়া-গোয়ালগাছ বর্ডারের (৪৮৮ নং পিলার থেকে ৭৩০ নং পিলার পর্যন্ত) বাংলাদেশের ভূ-ভাগের প্রায় এক হাজার একর জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। সীমানা পিলার উৎপাটন ও সহস্র একর জমি বেদখল হবার পরও বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে কোনই উচ্চবাচ্য করা হয়নি। অর্থাৎ 'সুহৃদ বন্ধু রাষ্ট্রের' এ আগ্রাসনকে নীরবে সমর্থন জানিয়েছে তৎকালীন আওয়ামী সরকার। ভারতীয়দের এ জবর দখলের ভয়াবহ খবরটি ছেপেছে চরম ভারতপন্থী ও খোদ ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের অংশিদারীত্বে প্রকাশিত দেশের আর একটি ঘাদানিক সংবাদপত্র। (দৈনিক জনকণ্ঠ ২৯ মার্চ, ২০০১)
- ঐ তারিখে সরকার সমর্থক দৈনিক জনকণ্ঠ আরো লিখেছে, পঞ্চগড় জেলার বোদা, পঞ্চগড় সদর ও দেবীগঞ্জ উপজেলার ৭টি সীমান্তবর্তী মৌজার এক হাজার একশত সাতাশ একর জমি বিএসএফ-এর সহযোগিতায় ভারতীয়রা দখল করে নিয়েছে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯.০৩.০১) তিস্তা নদীর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অব্যাহত ভাঙন ও বন্যায় ভারত-বাংলাদেশ সীমানা নির্দেশক পিলার ভেসে যাওয়ায় ভারতীয়রা বিএসএফ-এর সহযোগিতায় ঐ অঞ্চলের প্রায় ২০০০ একর, নীলফামারী জেলার ডিমলা থানার ছাতাইন ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী এলাকার আরো কয়েক হাজার একর জমি জোরপূর্বক দখল নিয়েছে। (দৈনিক সংগ্রাম, ১৯.০৯.২০০০)
- শুধু বাংলাদেশের ভূমি দখল করেই নয়, হিংস্রদানব প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বিগত ১১ বছরে প্রায় ২৩০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। বিডিআরসহ ঐ হতভাগা বাংলাদেশী নাগরিকদের বেশিরভাগই বিএসএফ-এর গুলিতে প্রাণ হারায়। শুধুমাত্র গত বছর (২০০০) সালে বি.এস.এফ-এর হাতে

www.amarboi.org

মোট ২৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত হয়েছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত আওয়ামী শাসনামলে মোট ১২৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছে ভারতীয় বিএসএফ-এর গুলিতে। আহত হয়েছে মোট ২১২ জন বাংলাদেশী। ঐ সময়ে সীমান্তে সর্বমোট ৩১০টি ভারতীয় হামলা ও-গোলাগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়।

- ভারতীয় বিএসএফ-এর সীমান্ত হামলা, ভূমিদখল, ভারতীয় পুলিশের ডাকাতির সাথে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত আগ্রাসনের নতুন মাত্রা হচ্ছে বাংলাদেশী তরুণ নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করার জন্য সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ বোতল ফেনসিডিল ও শত শত কিলোগ্রাম, হেরোইনসহ আরো নানা ধরনের ভয়াবহ মাদকদ্রব্যের পাচার ও চোরাচালান। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ভারতীয় মাদকদ্রব্যের বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পরোক্ষ মদদ ও সহযোগিতায় বাংলাদেশে এখন ভারতীয় মাদকদ্রব্য মদ, গাঁজা, ভাং, চরস, হেরোইন, ফেনসিডিলের অবাধ চোরাচালান চলছে। বাংলাদেশের বাজারকে সামনে রেখে সীমান্ত পথে ড্রামে ড্রামে পাচার করা হচ্ছে ঐসব ভারতীয় কারখানার তৈরি প্রজন্মনাশী ভয়াবহ মাদকদ্রব্য। বাংলাদেশের কিশোর, তরুণ ও যুবকদের নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার জন্যেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভারত বাংলাদেশে ঐ মাদক আগ্রাসন চালাচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। (দৈনিক মানবজমিন, ০৪.০১.২০০১)

- বাংলাদেশের বর্তমান সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যবহৃত সব ধরনের মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রায় ৮০% ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকছে। আগ্নেয়াস্ত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের দেশীয় বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, শর্টগান, রাইফেল, বোমা, চকোলেটবোমা, গ্রেনেড এবং আরএসডি-টিএনটি এক্সপে-াসিভ-বিস্ফোরক ইত্যাদি। ১৬ এপ্রিল ২০০১ তারিখে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিডিআর সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার তামাবিল সীমান্তের পাদুয়া গ্রামটি ভারতীয় বাহিনীর কবল থেকে পুনর্দখল করলে তার প্রতিশোধে ভারতীয় বিএসএফ কুড়িগ্রামের রৌমারী থানার বড়াইবাড়ী গ্রামে প্রায় ৪০০ সৈন্যসহ আক্রমণ চালায়। বাংলাদেশের বীর বিডিআর বাহিনীর মাত্র ১১ জন সৈন্য ভারতীয় বি.এস.এফ-এর ঐ অতর্কিত হামলার উপযুক্ত জবাব দিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌম অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আগ্রাসী ভারতীয় বিএসএফ-এর ১৭ জন সৈন্যকে করুণভাবে জীবন দিতে হয় এবং আহত হতে

www.amarboi.org

হয় আরো প্রায় অর্ধশত ভারতীয় হানাদারকে। উল্লেখ্য ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের শাসনামলের শেষ দিকে ভারতীয় বাহিনী ডাউকি-তামাবিল সীমান্তের প্রায় ২৩৭ একর বাংলাদেশী সার্বভৌম অঞ্চল নিয়ে গঠিত গ্রাম পাদুয়া জোরপূর্বক দখল করে নেয়। (১৭, ১৯ এপ্রিল, ২০০১, ইত্তেফাক/সংগ্রাম)

একশ বছরের রাজনীতির ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে যেভাবে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আওয়ামী লীগের ভরাডুবি ও জোট সরকারের উত্থান প্রমাণ করে এদেশের মানুষ ইসলামের স্বাতন্ত্রবোধ রক্ষা ও ভারতপ্রীতির বিরুদ্ধে তাদের ঐতিহাসিক ম্যান্ডেড প্রদান করেছে। কিন্তু জোট সরকার দশমাসের ব্যবধানে যমুনা গ্রুপকে মদের লাইসেন্স প্রদান, সম্প্রতি ফরিদপুরে ইসলাম ধর্ম, মুহাম্মদ (সা) এবং মা ফাতেমা (রা)-কে কটাক্ষ করে যে নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। থিয়েটারের মঞ্চায়িত "কথাকৃষ্ণ কলি"-নাট্যকারকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ সরকার এখনও এই সকল ক্ষেত্রে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নির্মমতা, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না।

www.amarboi.org

মালয়েশিয়া : সফল নেতৃত্বের অন্যতম মডেল

International Islamic University Malaysia (IIUM) এর invitation পেয়েছি ২ বার তারিখ পরিবর্তন করে অবশেষে।

দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে গত ০৯-০৬-০৮ তারিখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। মালয়েশিয়া এয়ার লাইন্স এর টিকেট confirm করা হলো। এক সপ্তাহের সফর তাও আবার Back টিকেটের তারিখ Open রাখা হলো। যাতে যে কোন সময় দেশে ফেরা যায়; যদিও টিকেটের মেয়াদ ছিল ৩ মাস।

কৌতূহলটাও কম না। সফরসঙ্গী কিশোরকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক মেধাবী ছাত্রনেতা শিশির মুহাম্মদ মনির। সফরের উদ্দেশ্যটা যত মহৎ তার থেকে মালয়েশিয়াকে জানবার অন্তর্নিহিত দিকটিই আস্তে আস্তে প্রাধান্য হয়ে উঠল। তার কয়েকটি কারণ ছিল–

এক. মালয়েশিয়া বর্তমান বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিকভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দেশ।

দুই. বিশ্বের পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে মুসলিম দেশ হিসেবে বলিষ্ঠতার সাথে টিকে আছে মালয়েশিয়া।

তিন. গ্লোবালাইজেশন-এর যুগেও মালয়েশিয়া মুসলমান, চাইনিজ ও ইন্ডিয়াকে নিয়ে পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক ও দেশপ্রেমের নজির স্থাপন করেছে।

চার. নলেজ Based country হিসাবে মালয়েশিয়া ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে।

পাঁচ. মাহাথির মোহাম্মদ ও আনোয়ার ইব্রাহিমের Charismatic Leadership মালয়েশিয়া বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

ছয়. মাল্টিন্যাশনাল দেশ হিসেবে মালয়েশিয়া বিশ্বের দরবারে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

এই সফর ছিল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মনে হয় জন্মগত অন্ধের আক্ষেপের চেয়ে চোখ হারানো ব্যক্তির বেদনা অনেক বেশি। কারণ জন্মান্ধ জানেই না চোখের মর্ম। সম্ভবত আমাদের বেদনা বর্তমান সময় চোখ হারানো ব্যক্তির বেদনায় চেয়ে অনেক বেশি কারণ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিতে শুরু করেছে, তখন রাহু গ্রাস যেন সিডরের আঘাত হানার মতো আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে ঐ দেশটির সাথে আমি পার্থক্য করার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের কি আছে কি নাই। তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? দিন দিন এগিয়ে চলেছে, কি তাদের পুঁজি? এর অনেক প্রশ্নই আমার মধ্যে দোলা দিয়েছে। মালয়েশিয়া সফর করে এসে কিছু একটা লিখব এই প্রস্তুতি ছিলো আগে থেকেই। তাই ঘুরে ফিরে দেখার ফাঁকে ফাঁকে নোট করেছি। .. যা নোট করে রেখেছি তাই মূলত আমার পুঁজি। এটি অনেকটাই আমার নিজের ভাললাগা মতামত বটে, অন্য কোন দলিল ও পরিসংখ্যা নয়।

www.amarboi.org

১০-০৬-০৮ তারিখ রাত ১টায় ফ্লাইট। বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সম্মানিত কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুর রহমান পরিষদ সদস্য ভাইদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে বললেন, "আল্লাহ আমাদের এই ভাইদের তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। তারা যেন এই শহীদি কাফেলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, সংগঠনের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারে, তাদের সেই তৌফিক দাও।"

সত্যিই তখন প্রচণ্ড একটি চাপ অনুভব করলাম। আমাদের জনশক্তি, সুধী, শুভাকাঙ্ক্ষীদের টাকায় বিদেশ যাওয়া। বিমানবন্দরে সি অফ করতে গেলেন, কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক আসাদুল্লাহ ভাই, ঢাকা মহানগরী উত্তর সভাপতি শামসুল আরেফিন হাসিব ভাইসহ আরো ২ জন।

বিমানের মাঝে কিছু বিরক্তিকর সময় কাটল। আমরা ৬টার সময় মালেয়েশিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছলাম । আমাদের Receive করার জন্য অসলেন মাওঃ একেএম ইউসুফ সাহেবের নাতি, হাসান আল বান্না ও হযরত আলী। তার দুইজনই (IIUM) এর ছাত্র। হাসান নিজেই অবশ্য ড্রাইভিং করছে। বিমান বন্দরে থেকে আমরা ছুটে চলছি শহরের দিকে আর সাথে সাথে জিজ্ঞাসা তো আছেই।

আবহাওয়া আমাদের দেশের মতই। সেখানে আমাদের দেশের মত কোন ঋতু নেই, প্রতিদিনই প্রায় কিছু কিছু বৃষ্টি হয়। এই জন্য না গরম না ঠাণ্ডা।

আমরা গিয়ে উঠলাম Angkatan Belia Islam Malaysia সংক্ষেপে Abim এর নিজস্ব হোটেলে আনজুম রাহমাহে।

এবার সকলে নাস্তা করতে বের হলাম। দোকানদার কর্মচারী সবাই মালেশিয়ান তারা মালে ভাষা ছাড়া ইংরেজি বুঝেই না। আচ্ছা মুসকিল! অনেক কষ্টে রুটি ডিম মিলিয়ে তৈরি করতে বুঝাতে পেয়ে হাফ ছাড়লাম, যাক এবার নাস্তা হবে। অনেক কষ্ট করে বুঝিয়ে নেয়া জিনিস দুধ চা নিয়ে আসল with ice। মালয়েশিয়ায় সকল পানীয়র সাথে Ice দিবেই। যাক এবার মালয়েশিয়ান Mose এর মোবাইল সিম কিনতে গিয়ে আরেক বিপদ। নাস্তার দোকানের মতই অবশেষে ইংরেজি বুঝাতে না পেরে ভাবছি কি করব। পাশে দেখলাম এক লোক ইংরেজি পত্রিকা পড়ছে। তাকে উকিল নিয়োগ করতে তার কাছে ছুটে গেলাম, ভাবলাম সে ইংরেজি ভাষা বুঝবে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর দেখলাম সেও আমাদের কথা বুঝে না। ভাবলাম লোকটি ইংরেজি পত্রিকা পড়ে, অথচ আমাদের কথা বুঝে না কারণ কী? তাকিয়ে দেখি ইংরেজি Alphabet মালয়ে ভাষায় পত্রিকা। অবশেষে এখান থেকেও উদ্ধার হলাম আর বললাম, আল্লাহ ভাষা যে তোমার কত বড় নেয়ামত! এই জন্যই কোন বেরসিক বলছে যে সৌদি আরবে সালাম আর আজানটাই বাংলায় দেয় আর সবই আরবি।

অনেক মালয়েশিয়ানের সাথে কথা বলেছি, অনেক ছাত্র শিক্ষক, শ্রমিকদের সাথে কথা বলেছি। আলোচনা হয়েছে গাড়ির ড্রাইভারদের সাথে। আলাপকালে এক

www.amarboi.org

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, Whats your comments about your leader Mahathir and Badabi? সে বলল, both are well.

এই অনন্য চরিত্রের মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। মাহাথির ক্ষমতায় এসেই সর্বপ্রথম সবাইকে সময় মেনে চলার নির্দেশ দিলেন। দেশব্যাপী সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসের উপস্থিতির সময় রেকর্ড করার জন্য তিনি উৎপাদনী কারখানার শ্রমিকদের মতো পাঞ্চ কার্ড ব্যবহারের রীতি চালু করেন। তিনিও এই কার্ড ব্যবহার করে অফিস করতে শুরু করেন। সুপ্রসিদ্ধ টাইম ম্যাগাজিন একবার মাহাথিরের পর পর পাঁচ দিন অফিসে ঢোকার সময়ের রেকর্ড প্রকাশ করে। তিনি পর পর পাঁচদিন সকালে অফিসে প্রবেশ করেছিলেন- ৭.৫৭, ৭.৫৬, ৭.৫৭, ৭.৫৯ এবং ৭.৫৭টায়। অর্থাৎ তিনি অফিস সময় শুরু সকাল ৮টার পূর্বেই অফিসে আগমন করেছিলেন। অধিকাংশ দিনই তিনি অন্তত সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত কাজ করেন।

আধুনিক মালয়েশিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা মাহাথির দেশে গাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেন। প্রোটোন সাগা (Proton Saga) নামের মালয়েশিয়ান গাড়ি তৈরি হয় জাপানি মিটসুবিশির সহায়তায়। মিটসুবিশি কোম্পানিতে গাড়ি কিনতে গিয়ে মাহাথির নিজেই ট্রাক ও এম্বুলেন্স চালিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইলট এবং বহু সময় নিজের প্লেন নিজেই চালিয়েছেন। অফিসে তাঁর দু'টি কম্পিউটারে দেশের সব প্রয়োজনীয় তথ্যের রেকর্ড থাকত। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ও সফল কম্পিউটার অপারেটর।

জাতিগত সমস্যা নিরসনে সচেষ্ট ছিলেন মাহাথির। পিছিয়ে পড়া মালয়দের ভাগ্য উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকেন। তিনি নতুন অর্থনৈতিক (NEP- New Economic Policy) নীতির প্রবক্তা। তার আমলে মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদৃঢ় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সহজে ও কম খরচে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাবুং হাজী বা হজ ব্যাংক এবং বর্তমান বিশ্বে ইসলামী জীবনবীমাব্যবস্থা বা তাকাফুলের সূচনা ও বিকাশ লাভ করেছে মালয়েশিয়ায়। 'বালাই ইসলাম' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা জনগণের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে যাকাত বোর্ডে জমা দেয়। যাকাত বোর্ড পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ৮টি খাতে তা জনগণের কল্যাণে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করে। মাহাথির শুধু ব্যবসায়ীদের অনুপ্রাণিত করেননি, দেশজুড়ে গণজাগরণেরও জন্ম দিয়েছেন তিনি। তারই প্রেক্ষিতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা, এভারেস্টে আরোহণ করাসহ অনেক অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে মালয়েশিয়ানরা। মহাকাশে পাঠিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ। মাহাথির মোহাম্মদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

১৯৮২ সালে মালয়েশিয়ার গ্রোস ডোমেস্টিক,প্রোডাক্ট (মোট জাতীয় উৎপাদন) বা জিডিপি'র পরিমাণ ছিল ২৭.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০০২-এ বেড়ে দাঁড়ায়

www.amarboi.org

৯৫.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। বৈদেশিক বাণিজ্যে সারপ্লাস বা উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৯৮৪-তে শূন্য থেকে ২০০২-এ দাঁড়ায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সুকর্ন বলেছেন, "আমাকে দশজন যুবক দাও, তাহলে আমি সারা বিশ্বকে তোলপাড় করে দেব।" কিন্তু মাহাথিরের কাছে ব্যাপারটি হচ্ছে- তাঁকে দশজন যুবক দেয়া হলে তিনি মালয়ীদের সাথে নিয়ে বিশ্বজয় করে ফেলবেন। (Indonesia's first president Sukarno said, "Give me ten young men and I shall rock the world," but for Mahathir, if he is given ten young men the Malays will be able to conquer the world). বাস্তবেও হয়েছে তাই। মালয়েশিয়ার নতুন প্রজন্মকে তিনি স্বদেশপ্রেমে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে, তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশকে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তো অবাক পৃথিবী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মাহাথিরের মালয়েশিয়ার দিকে!

পৃথিবীর ইতিহাসে আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত রাষ্ট্রনায়কই তো দেশ শাসন করেছেন। তাদের কেউ কেউ জয় করেছেন দেশের পর দেশ। এদের অধিকাংশই দেশের জনগণের মন জয়ের চেয়ে দেশ জয়কেই বড় করে দেখেছেন। এতে করে সর্বকালেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ জনগণ। তারপরও লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত জনগণের পুঞ্জিভূত কামনায় সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব এসেছে যুগে যুগে। তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পিছিয়ে পড়া জনগণকে আলোর পথ দেখাতে চেষ্টা করেছেন বার বার। বর্তমান পৃথিবীতে সে রকম কয়েকজন নেতা বা রাষ্ট্রনায়কের নাম স্মরণ করলে প্রথমেই যাঁর নাম আসবে, তিনি হচ্ছেন মালয়েশিয়ার মহানায়ক ড. মাহাথির বিন মোহাম্মদ। দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে তিনি পরিণত হয়েছেন এক জীবন্ত কিংবদন্তিতে।

অবশ্য তাঁর জীবন চলার পথ ইতিহাসের সেই "এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন" গল্পের মতো অতোটা সহজসূত্রে গাঁথা নয়। বরং তাঁকে দেশের শাসন কাজে নেতৃত্বের নানা চড়াই-উৎড়াই পার হতে হয়েছে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে। সে সব টালমাটাল পরিস্থিতি শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁর নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা। তাঁর এই বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণেই মালয়েশিয়া আজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করে এশিয়ার অন্যতম একটি শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। সে সাথে তিনি হয়েছেন দেশকালের সীমার বাইরে একজন বিশ্বনেতা।

এটি দেশপ্রেমের আরেক নজির। একবার মালয়েশিয়ায় চিনির সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ডা. মাহাথির দেশবাসীকে বললেন, আমাদের যে পরিমাণ চিনি মজুদ আছে আমদানি না করে তা দিয়ে আমরা চলতে পারব যদি চিনির ব্যবহার কিছুটা কমানো যায়। একথা শোনার পর দেশের জনগণ এক যোগে চিনি খাওয়া কমিয়ে

www.amarboi.org

দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কয় দিন পর দেখা গেল আমদানি তো দূরের কথা রপ্তানি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এইতো নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের নমুনা!

হোটেল থেকে খুব সকালে বের হলাম। Appointment নেয়া হলো FUTURE GLOBAL NETWORK এর প্রেসিডেন্ট AHMAD AZAM AB RAHMAN এর। তার অফিসেই নাস্তার দাওয়াত। হরেক রকম আয়োজন। ভাগ্যক্রমে সাক্ষাত পেয়ে গেলাম Br. Hj Mohd Annur Mohd Salleh, Honorary Students' counselor of ISLAMIC DEVELOPMENT BANK in Malaysia. যাকে সচরাচর পাওয়া খুবই দুষ্কর। আনন্দের বিষয় হলো তারা আমাদের এমন আন্তরিকভাবে রিসিভ করলেন, মনে হয় অনেক আগে থেকে তাদের সাথে পরিচিত। বিষয়টা পৃথিবীর কোন অক্ষরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। এ তো বুনিয়ানুম মারসুছ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! ইসলামী আন্দোলনের উম্মাতদের প্রেরণা। কোন অজানা অচেনা যাদের সাথে ভাষা মাতৃকার কোন মিল নেই এমন লোকের প্রতি তাদের এই আন্তরিকতা আমাদেরকে আবেগাপ্লুত করেছে।

AHMAD AZAM AB RAHMAN আবিম এর সাবেক সভাপতি। তিনি বাংলদেশে আমাদের সম্মেলনে আসার কারণে ছাত্রশিবিরকে খুব ভালোভাবে জানেন। এখানে উল্লেখ্য যে যারা ইতোপূর্বে বাংলাদেশে সফর করেছেন আর যারা করেননি আমাদেরকে Reception দেয়ার মধ্যে কিছুটা হলেও পার্থক্য ছিল। তার মধ্যে আনোয়ার ইব্রাহীম, আবিমের সভাপতি Mr. Yusri Mohamad-সহ অনেকেই উল্লেখযোগ্য।

আনোয়ার ইব্রাহীম আমাদের দেখে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছেন তা কারো ভালোবাসায় সিক্ত আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম মূহূর্ত। আমি যখন ৭ম শ্রেণীতে পড়ি, লক্ষ্মীপুর জেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ। তিনি বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ থেকেই আমাদের সাথে হাত মিলালেন। একটু হাত মিলাতে পারাই যেন মহা পাওয়া! তার মাঝেও ঘাম মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা "কোন ক্লাসে পড়, ভাইয়া? আহ খুব কষ্ট হয়ে গেছে তাই না?" সেদিন থেকেই আমি ছাত্রশিবিরের জন্য পাগলপারা হয়েছি। ভালবাসা যে কত শক্তিশালী, কত বেপরোয়া এবং কত দূরন্ত তা যে জানে সেই মানে। রাসূল (সা) অতি অল্প সময়ে জাহেলিয়াতের সকল হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি নিবৃত করতে সক্ষম হয়েছেন ভালবাসার পরশ দিয়ে।

এর ফাঁকে আমরা আমাদের কাজের একটা Presentation তুলে ধরলাম। উভয় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ইসলামী আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হলো দীর্ঘ সময়। এই দুজন তাদের অবস্থানে অদ্বিতীয় আর বিরোধীদলীয় নেতা হবু প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের খুবই ঘনিষ্ঠজন। আমরা জানতে চাইলাম মাঝপথে

www.amarboi.org

আনোয়ার ইব্রাহিমের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, আমাদের দেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় যে কোন সময় সংসদ সদস্যগণ নিজের আত্মপোলব্ধি ও দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে যে কোন দলে যেতে পারেন। এটা বাংলাদেশে অসম্ভব শুধু নয়, সদস্যপদও হারাতে হয়।

সেখান থেকে বের হয়ে রওনা হলাম। আলাপকালে এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, What's your comments about your leader Mahathir and Anwar Ibrahim? সে বলল, both are well. এ কথা শুনে ভাবলাম, হায়রে আমার বাংলাদেশ! এ সহনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে আজ জ্বলে পুড়ে ছারখার। আমাদের কষ্টার্জিত গণতন্ত্র আজ প্রায় বিপন্ন। ১/১১-এর পর এ বিপর্যয় আমাদের দেশের কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতারই ফল। আমাদের দেশে এ রকম কয়জন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা বলবে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয় দেশের জন্য ভালো। আমরা পারিনি এ রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করতে।

অথচ মাহাথির মোহাম্মদ রাজনীতিতে একটি নতুন সংস্কৃতি সংযোজন করেন। সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনীতি। তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য 'কেবল ক্ষমতা চর্চা' ছিল না; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উন্নতি সাধনই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। নিজে প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সরকারকে নিছক সরকার হিসেবে দেখতেন না, দেখতেন সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার পরিচর্যাকারী, জনগণের সেবক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিকদের মাঝে এ এক বিরল দৃষ্টিভঙ্গি। মাহাথির এক্ষেত্রে বহুকাল যাবৎ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। কিন্তু পরিশুদ্ধ চিন্তার এই মানুষগুলো যে কারখানায় তৈরি হয় সেটাও তারা তৈরি করেছেন। হায়রে ৯৫% মুসলমানের দেশ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজও আমাদের চেতনা ও বিশ্বাসে লালিত মানুষ তৈরি করতে পারছে না। আজও শিক্ষাব্যবস্থা এখানে কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারেনি। শিক্ষা কমিশনের পরে শিক্ষা কমিশন। যেন কোনই সমাধান নেই। অথচ, মালয়েশিয়া সোনার তৈরি দেশ। অনন্য শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে বিশ্বব্যাপী নতুন প্রজন্ম তৈরি করছে। যারা সমৃদ্ধ মালয় গড়তে নিজেদের সততা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রাখছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাদাবি এবং আনোয়ার ইব্রাহিম দু'জনই এই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

আজকের আধুনিক পৃথিবী একথাই প্রমাণ করছে যে মানুষের শান্তির জন্য প্রধান হুমকি অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যতাই নয় বরং অনৈতিকতাও একটি বড় সমস্যা। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন Morality, Manner বা Ethics. আর সেই জিনিস মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র জাগ্রত করতে পারে

www.amarboi.org

ইসলামী শিক্ষা। এই জন্যই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দটিই ছিল 'ইক্‌রা'। পৃথিবীর সকল ধর্মই মানুষকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। রাসূল (সা) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, "তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।" নোবেল বিজয়ী লিও টলস্টয়কে বলা হয়েছিল, জাতীয় উন্নয়নের জন্য আপনি যুব সমাজের প্রতি কিছু বলুন। তিনি বলেছিলেন, আমার পরামর্শ তিনটি – পড়, পড় এবং পড়।

সঠিক ক্যামেরা মনিটরিংয়ে আমার মনে হচ্ছে এক মনোরম বিস্তৃত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ঘেরা অপরূপ মহিমায় ভাস্বর এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতি গঠনে যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি জিনিসই আধুনিকতা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে বাংলাদেশী ছাত্রদের একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করা হলো। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমাদের দেখা হয় বুয়েটের সাবেক শিক্ষক প্রফেসর সদরুল ইসলাম স্যারের সাথে। বাংলাদেশী ছাত্ররা পৃথিবীর সব জায়গায় নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে তার প্রমাণ IIUM. বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবতকালের সেরাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে নূরুল্লাহ ও শাহাদাতসহ অনেকে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মালোয়েশিয়ার যে কোন মানুষই শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। এর কারণ তাদের শিক্ষাব্যবস্থা। তাদের এই শিক্ষাব্যাবস্থার কৃতী স্বাক্ষর বহন করছে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া। যাকে সংক্ষেপে বলা হয় আইআইইউএম।

আইআইইউএম সমগ্র মুসলিম বিশ্বের পূরণ হওয়া একটি স্বপ্ন, যা যুক্ত করেছে অহির সাথে যৌক্তিতাকে, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের এবং পেশাগত কোর্সের সাথে নৈতিকতাকে। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে লালিত পালিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছে ভবিষ্যতের মহান নেতৃবৃন্দ।

মিশন ও ভিশন :

আইআইইউএম-এর মিশন হচ্ছে–১. Integration (সমন্বিতকরণ); ২. Islamization (ইসলামীকরণ); ৩. Internationalization (আন্তর্জাতিকীকরণ); এবং ৪. Comprehensive Excellence (ব্যাপক উৎকর্ষ)

আইআইইউএম-এর ভিশন হচ্ছে নিম্নরূপ :

"NSPIRED BY THE WORLD-VIEW OF TAWHID AND THE ISLAMIC PHILOSOPHY OF THE UNITY OF KNOWLEDGE AS WELL AS ITS CONCEPT OF HOLISTIC EDUCATION."

অর্থাৎ- তাওহীদের বিশ্ব দর্শন এবং ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষার ধারণা ও জ্ঞানের একতার ইসলামী দর্শনে উজ্জীবিত করা।

www.amarboi.org

আইআইইউএম-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার উৎকর্ষের এমন একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়া যা,

১. ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহ্-এর বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করবে;
২. একাডেমিক সকল বিভাগ এবং শিক্ষা কার্যক্রমে ইসলামের অহির জ্ঞান এবং মূল্যবোধকে সমন্বিত করবে;
৩. জ্ঞানের সকল বিভাগে মুসলিম উম্মাহ্-এর অগ্রসরমান এবং নেতৃত্বদানকারী ভূমিকাকে পুনরুদ্ধার করবে; এবং তার দ্বারা
৪. মানবজীবন ও সভ্যতার গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার মত আর কোন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশ্বে নেই। এটিই একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে ইংরেজি ব্যবহার করা হয়। সৃজনশীলতা এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক, পেশাগত বিভাগগুলোকে প্রথাগত মূল্যবোধ এবং নৈতিক গুণের সঙ্গে একত্রিত করে শিক্ষা দেয়। এর ছাত্রছাত্রীরা আসে ৯০-এর অধিক দেশ থেকে এবং এর মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। ঠিক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইআইইউএম জ্ঞানের সকল শাখায় সম্ভব সর্বোত্তম উচ্চশিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি একাডেমিক বিভাগগুলোর জন্য সবচেয়ে দক্ষ পণ্ডিত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য উদ্যমী পেশাজীবীদেরকে নিয়োগ দেয়ার জন্য গোটা বিশ্বকেই সার্চ করে। এর সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ঈর্ষার বিষয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের রয়েছে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ঐসব নিয়োগকর্তার কাছে যারা জ্ঞানী এবং দক্ষ পেশাজীবীর সাথে সাথে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রার্থী খোঁজেন।

তা ছাড়াও, এখানে আশাবাদ এবং মধ্যমপন্থার চর্চা করা হয়। ১৯৮৩ সালে এই বিশ্বদ্যিালয়ের প্রতিষ্ঠা ছিল জ্ঞানের সন্ধানে মুসলিম উম্মাহ্-এর নেতৃত্বের পুনরুদ্ধারের জন্য সমকালীন মুসলিম বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান আশার প্রতিফলন। মুসলিম উম্মাহ্-এর এই আগ্রহই আইআইইউএম-এর ভিশন বক্তব্যের মূল উপাদান। আর এই বক্তব্যটি হল:

"To be an international centre of educational excellence which integrates Islamic revealed knowledge and values in all disciplines and which aspires to the restoration of the Ummah's leading role in all branches of knowledge."

অর্থাৎ– শিক্ষার উৎকর্ষের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া যা অহির জ্ঞান ও মূল্যবোধকে সমন্বিত করবে সকল বিভাগে এবং যা প্রত্যাশা করে জ্ঞানের সকল শাখায় মুসলিম উম্মাহ্-এর নেতৃত্বের পুনরুদ্ধারের।

www.amarboi.org

অনুষদসমূহ :

আইআইইউএম-এ বিভিন্ন অনুষদকে "কুল্লিয়া" বলা হয়। এখানে মোট ১৩টি কুল্লিয়া রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: 1. Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, 2. Kulliyyah of Economics and Management Sciences, 3. Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, 4. Kulliyyah of Allied Health Sciences, 5. Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, 6. Kulliyyah of Engineering, 7. Kulliyyah of Information and Communcation Technology, 8. Kulliyyah of Dentistry, 9. Kulliyyah of Pharmacy, 10. Kulliyyah of Science, 11. Kulliyyah of Nursing, 12. Kulliyyah of Medicine and 13. Kulliyyah of Education.

ইনস্টিটিউট এবং সেন্টারসমূহ:

আইআইইউএম-এ বিভিন্ন ইনস্টিটিউট এবং সেন্টারের সংখ্যা হচ্ছে ১১টি। এগুলো হল : 1. Institute of Education, 2. Institute of Islamic Banking & Finance (IIiBF), 3. Advanced Engineering and Innovation Centre, 4. Centre for Built Environment, 5. Harun M. Hashim Law Centre, 6. Institute for Language Advancement, 7. Management Centre, 8. Centre for Human Development and Applied Social Sciences, 9. Breast Centre, 10. Centre for IT Advancement and 11. Centre for Teaching and Learning

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ব্যবস্থা:

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি ক্যাম্পাসের ৪টি লাইব্রেরির সমন্বয়ে। এর মোট সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫৫৭,৭৬টি মনোগ্রাফ, ১,৬৭৪টি সিরিয়াল টাইটেল, ২৪,০৬৬ ভলিউম বাউন্ড সিরিয়াল, ৬০,০৯১ ইউনিট অডিওভিজ্যুয়াল এবং ২৯,১৪৮টি মাইক্রোফরম। ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার ছাড়াও লাইব্রেরিটির রয়েছে অনেক অনলাইন ডাটাবেজ, ইলেকট্রনিক জার্নাল ও বইয়ের সাথে চাঁদার মাধমে প্রবেশাধিকার। লাইবেরির সকল তথ্য ও সুবিধা নিম্নোক্ত ওয়েব ঠিকানায় পাওয়া যাবে: http://www.lib.iium.edu.my

–নভেম্বর ২০০৮ইং

www.amarboi.org

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও নকল : জোট সরকারের পদক্ষেপ

একটি জাতির উন্নতি অগ্রগতির পিছনে সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকাই মুখ্য। "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। কিন্তু বাংলাদেশে এই মেরুদণ্ডকে ভেঙে একটি প্রতিবন্ধী সমাজ গড়ে তোলার কাজেই আমরা ব্যতিব্যস্ত। ক্ষমতার পালাবদলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের একটি কমিশন গঠন করে একটি মোটা অঙ্কের লোক দেখানো বাজেট পেশ করে দায়সারা দায়িত্ব সমাপ্ত করে থাকেন প্রতিটি সরকার। অথচ শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কেমন হবে, শিক্ষার কি উদ্দেশ্যে, কি দেয়া হবে, শিক্ষার্থী কি উদ্দেশ্যে গমনাগমন করবে, শিক্ষক কোন যোগ্যতা বলে কি উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রত পালন করবেন, শিক্ষার্থীর কি পরিবর্তন সাধিত হবে– এ বিষয়ে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সমাজের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তিও সম্পূর্ণ উদাসীন আর এই হতোদ্যম ও উদাসীনতার মধ্যদিয়েই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত ও হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা যতটা উন্নত করার কথা সেই সামান্য রত্নটুকুও আজ রাহুর কবলে নিমর্জ্জিত। সন্ত্রাস ও নকল এই দুটি আত্মঘাতি ব্যাধি আজ "সিন্দাবাদের বুড়ি"-র মত জাতির ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের যুবসমাজকে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। এই মরণব্যাধির গ্রাস "এইড্‌স" থেকেও আরো মারাত্মক। এ রোগের দ্রুত চিকিৎসা করতে না পারলে জাতি হিসাবে আমরা রোগা, অকর্মা এবং শক্তিহীন হয়ে পড়ব এতে কোন সন্দেহ নেই। এর নিরাময়ে প্রত্যেকে প্রকাশ্য বুলি আওড়ালেও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রলেপ মালিশ আর তোষামোদ এখন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের চরিত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, বিগত আওয়ামী আমলে সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ সন্ত্রাসকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে। শিক্ষাঙ্গনে কোমলমতি ছাত্রসমাজকে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে এখন আর শিক্ষাঙ্গন এবং বাইরের সন্ত্রাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হত্যা, লুণ্ঠন, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ধর্ষণের সেঞ্চুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছাত্রসমাজ এগিয়ে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ মেধাশূন্য সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতি বন্ধের আহক্ষান ইতিপূর্বে জাতির সামনে পেশ করেছিলেন, কিন্তু তার যথার্থ মূল্যায়ন না করে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঠিক তেমনি জোট সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের যে আহবান জানিয়েছেন তা জাতীয়

www.amarboi.org

স্বার্থেই আমাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল। তবে তা না করে আমাদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা চটকদার বক্তব্যের মাধ্যমে এ আহবানকে প্রত্যাখান করে জাতির কাছে আরেকবার নিন্দিত হলেন। কারণ তিনি সন্ত্রাস বন্ধে আন্তরিক নন বরং তার শাসনামলে সন্ত্রাসকে এতটুকুই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন যে তাকে "সন্ত্রাসের জননী" বললেও ভুল হবে না। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংঘর্ষ কম, এটি স্বীকার করতেই হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোটভূক্ত একটি ছাত্রসংগঠনের টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অন্যায় আবদার শিক্ষার পরিবেশকে একপক্ষীয় সন্ত্রাসের কবলে নিমজ্জিত করেছে। বিশেষ করে বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যার মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জোট সরকারের ভাবমূর্তিকে অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছে। বিভিন্নভাবে সরকার হয়েছে সমালোচিত। হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারলে এর কিছুটা হলেও লাঘব হবে। আওয়ামী লীগ মূলত পয়েন্টের রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

সুতরাং নিজ দলের দুষ্ট ঘটনায় আওয়ামী লীগ যাতে কোনো সুযোগ না পায় সে ক্ষেত্রে অবশ্যই জোট সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। আওয়ামী শাসনামলের মত আজ সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয় মদদ, আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সচল। অথচ আওয়ামী সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিল মাসের পর মাস। কিন্তু আওয়ামী লীগ এতে ঈর্ষান্বিত হয়েছে, আর এ ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে ১ অক্টোবরের পর থেকে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে পুঁজি করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যানারে আওয়ামী বামরা জড়ো হয়ে ভিসি অপসারণের মাতম তোলে। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিতাড়িত সন্ত্রাসীরা আবার ক্যাম্পাসে তাদের আসাকে পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তার দলীয় assignment-এর বাস্তবায়ন করেছে। ঢা.বি'র সুর ধরে কালের হারিয়ে যাওয়া অতি উৎসাহী বামরামপন্থিরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ইন্ধনে রয়েছে ভারতীয় হাই-কমিশনের বেতনভুক্ত কতিপয় শিক্ষক ও নামধারী হলুদ সাংবাদিক। জোট সরকারের ১০ মাসের ব্যবধানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও একজন ভিসির পদত্যাগে বাধ্য করা একদিকে যেমনি জোট সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে, তেমনি বিরোধীদের করেছে আনন্দিত। তাই ঢা.বি'র মত রা.বি-তে আওয়ামী বামরা যেভাবে মাস্টারপ্লান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জোটভুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করা সময়ের দাবি। আর এই

www.amarboi.org

ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন করা সম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় যে, এখন আর জয়নাল হাজারী, তাহের, ড. ইকবাল, শামীম ওসমান, হাজী মকবুল গংদের মত কোনো গড ফাদারের নাম মানুষের মুখস্থ নেই। এখন তো বোমার কোনো আচানক কাহিনী শোনা যায় না। শোনা যায় না উদীচী, নারায়ণগঞ্জ, রমনা বটমূল, ৭০ কেজি বোমা এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের গভীর ষড়যন্ত্রের সেই কল্পিত কাহিনী। মূলত এই সকল আজগুবি, বানোয়াট ঘটনা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এরকম হাজারো রূপক ঘটনা আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের ব্রেইন হার্ডডিস্কে চিত্রিত চিল। পেঁচা যেমনি দিনের আলো সইতে পারে না, ঠিক তেমনি আওয়ামী লীগও এই জোট সরকারের এতো সাফল্যগুলো সহ্য করতে না পেরে জ্বলে-পুড়ে মরছে। তাই প্রতিটি মুহূর্তে জোট সরকারের ভাঙনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। সেই লক্ষ্যেই তারা এগুচ্ছে। ইতোমধ্যেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অনেকেই ছাত্রদলের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সরকারি দলের পরিচয় দিয়ে সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই অনেকের কাছে ছাত্রদলের ভূমিকা প্রশ্নবোধক। ১ অক্টোবর নির্বাচনে নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ একটি গণবিপ্লবের দলে পরিণত হয়েছে। কোনো ইস্যু ছাড়াই সংসদ বর্জন, হরতাল, পুন:নির্বাচনের দাবি একটি অসুস্থ রাজনীতির পরিচায়ক। এটি দেশের সাধারণ মানুষ এমন কি নিজ দলের অনেকেই পাগলের প্রলাপ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ঠিক সে সময়ে আন্দোলন এবং জোটের ভাঙন সৃষ্টি করার মত কোনো ইস্যু আওয়ামী লীগ যদি খুঁজে না পায় তাহলে অচিরেই তারা একটি জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আওয়ামী লীগ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জোটভূক্ত ছাত্রসংগঠন গুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর যে অপপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল, বুয়েট, চট্টগ্রাম বি.আই.টিসহ কিছু কিছু জায়গায় বিবদমান ঘটনা তারই উদাহরণ।

দুই : শিক্ষার সাথে নকলের গড়ে উঠেছে একটি সুগভীর সম্পর্ক। আর এর মুখ্য ভূমিকার নেপথ্যে রয়েছে কতিপয় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। জন্ডিসের রোগীকে বাহ্যিকভাবে না যতটুকু অসুস্থ মনে হয় তার থেকে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থাই বেশি খারাপ। তাকে তিলে তিলে কবরের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে নকলের অভিশপ্ত ব্যাধি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আজ শিক্ষিত এবং পাশের হার বৃদ্ধি পেতে থাকলেও শিক্ষার সেই গুণগত মান নেই। ইতোপূর্বে নকলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। তৎকালীন দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশ, ১৯৭২-৭৪ সালে

www.amarboi.org

পরীক্ষার হলে মাইক দিয়ে বলে দেওয়া হতো। এমনকি সিরিয়াল ও সময় মেইন্টেনে বলা হতো প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা এখন এত নম্বর প্রশ্নের উত্তর লিখ। সেই সম্প্রসারিত নকল আজ গোটা জাতিকে ধ্বংসের দারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। এবার পরীক্ষার হলে নকল সাপ্লাই করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হলেন অনেক শিক্ষক। আর এ সকল নামধারী শিক্ষকের নির্লজ্জ ভূমিকা শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনকে করেছে কলুষিত। কিন্তু এবার নকলের বিরুদ্ধে মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন সে জেহাদে প্রতিটি নাগরিক হবেন এক একজন যোদ্ধা। আর এই মহতী উদ্যোগকে দেশবাসী জানিয়েছে সাধুবাদ। তিনি হয়েছেন অভিনন্দিত। এই নকলবিরোধী আন্দোলনকে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি এগিয়ে নেয়া যায় তাহলে নকলের এই অভিশাপ থেকে এই জাতির পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের কোমলমতি ছাত্রদের টেক্সট বুক বাদ দিয়ে নকলমুখী করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত কতিপয় প্রকাশনী যারা "১০০% গ্যারান্টি", "অসম্ভব-সম্ভব" বিভিন্ন নামে ট্যাবলয়েড গাইড ছাপিয়ে নকলকে উৎসাহিত করছে। বন্ধু নামধারী এ জাতির শত্রুদের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এজন্য যেমনি প্রয়োজন উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি, তেমনি প্রয়োজন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রয়াস। নকল নির্মুল অভিযানে আমরা কতটুকু আন্তরিক সেটাই আজ দেখার বিষয়।

তিন : আমাদের যুবসমাজ আজ লক্ষ্যহীন পানে ছুটছে। আকাশ-সংস্কৃতিক নামে স্যাটেলাইট চ্যানেল, দেশী-বিদেশী সিনেমা, হিন্দি ফিল্ম স্টাইলে যৌন সুড়সুড়ি যুবসমাজকে ধক্ষংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে। এক সময়ের সিনেমা পরবর্তীতে ভিডিও এখন কম্পিউটারে ভিসিডি ছাত্রসমাজকে দ্রু অনৈতিকতার দিকে উৎসাহিত করছে।

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলামেশা আমাদের ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করছে। পবিত্র অঙ্গন হচ্ছে অপবিত্র। ক্যাম্পাসের এই ফ্রি স্টাইল মেলামেশা এখন স্বাভাবিক। এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, কতিপয় শিক্ষক অনৈতিকতার মহোৎসবে লিপ্ত। সম্প্রতি ঢা.বি, ই.বি শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীরা যৌন হয়রানির স্বীকার। ঢা.বিতে নামধারী নির্লজ্জ শিক্ষকদের যৌন হয়রানির হাত থেকে বাঁচার মিছিল জাতির বিবেকে রাক্ষসের ছোবল। তাহলে আমরা কি বর্বর? আমরা অসভ্য, ইতর? যে শিক্ষক পিতার মর্যাদায় আসীন তার আবার যৌন লিপ্সার চিন্তা কোথায়? কিন্তু এ সকল ঘটনার একটি তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমেই সমাপ্তি জাতি আর প্রত্যক্ষ করতে চায় না। যে সমস্ত রক্ষকেরা ভক্ষকের ভূমিকায় লিপ্ত তাদের অব্যশ্যই উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

www.amarboi.org

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপন করেছে। আর সরকার তার বিচার না করে মানিকউজ্জ্বল গংদের মেহমানের মর্যাদায় বিদেশে পাঠিয়ে অনৈতিকতার আরেক ধাপ ফলক উন্মোচন করেছে। কিন্তু জোট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর ঢা.বি, জা.বি, রা.বি, ই.বি-তে প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রীর অসামাজিক ও অবাধ মেলামেশা রোধে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার্থে Sunset Law এবং Warning বিনা Threating-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা কিছুটা হলেও আশান্বিত হয়েছেন সুশীল অভিভাবক মহল। কিন্তু এ ব্যাপারে যৌনলিপ্সু কতিপয় বামপন্থী ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া কেউ-ই বিরোধিতা করেনি। আমাদের দেশে আজকাল পাশ্চাত্য অনুকরণে "বয়ফ্রেন্ড", "লিভ টুগেদার" এমন কি ছাত্র-ছাত্রী হোটেল, ক্লাব ইত্যাদি স্থানে গিয়ে দেহ ব্যবসায় অবিশ্বাস্য ঘটনাও আজ ঘটাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের আবাসিক হল ছাড়াও মেয়েদের আবাসিক হলে দেদারছে ফেনসিডিল, মদ, গাঁজা, সিগারেট ইত্যাদির ছড়াছড়ি লক্ষ্যণীয়। এ অসুস্থ পরিবেশ আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। অনেকেই যৌবনের তাড়নায় হয়ে যায় উন্মাদ। অনেকের জীবন থেকে ঝরে পড়ে উচ্চশিক্ষার সোনালী স্বপ্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের জনৈক সাবেক ডীন এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেছেন, একজন মেধাবী ছাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষে যে ফলাফল করে পরবর্তীতে তা আর রক্ষা করতে পারে না। এর পেছনের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় প্রেমাসক্ত অথবা নেশাগ্রস্থতাই তার অন্যতম কারণ। তাহলে প্রশ্ন, আমরা কি সন্ত্রাসের কবল আর নকলের এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারব না? এখন মনে হয় "Our knowledge brings us to near ignorance. Our ignorance brings us near to death." কে আছে এই জাতির অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে? কোথায় সেই আত্মত্যাগী যোদ্ধা? আর এ দেশের মানুষ আশা করছে প্রধানমন্ত্রী দেশ এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রেসিডেন্টের পরিবর্তন, সেনাপ্রধানের নিয়োগ, জুট মিল বন্ধে যে ঐতিহাসিক ও যুগ উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে অভিনন্দিত হয়েছেন, তেমনি অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সন্ত্রাস, নকল ও শিক্ষার উন্নতিতে সফল অস্ত্রোপচার করবেন। সে দিকেই তাকিয়ে আছে সমগ্র দেশবাসী।

আগস্ট ২০০২

www.amarboi.org

তিন প্রধানের বেড়াজালে আওয়ামী বিধিবাম

বর্তমানে চৌদ্দদলের আন্দোলনের মূল টার্গেট হচ্ছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত তিন ব্যক্তি কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান বিচারপতি। বর্তমান সংবিধানের আলোকে কেয়ারটেকার সরকার দ্বারা দেশ পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধানে তাদের কার্যক্রম যেমনি সুনির্দিষ্ট এবং তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতটুকু তা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এই সময়ে বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে সোচ্চার আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল। কিন্তু এ আন্দোলন তারা তাদের জন্য একটি সফল আন্দোলন হিসাবে ভাবছেন, নাকি একটি ব্যর্থ, না সুপার ফ্লপ- সে পর্যালোচনা তাদের উপর ছেড়ে দেয়া যাক। কিন্তু একথা সত্য এখন যে সকল ইস্যু নিয়ে তারা আন্দোলন করছে ইতিপূর্বে তারা ৪ দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে অভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করে সুপার ফ্লপ খেয়েছে।

আওয়ামী লীগ কেয়ারটেকার সরকারের একটি দুর্বল সময়ে বিভিন্ন অযৌক্তিকতাকে যেভাবে যুক্তির আসনে বসিয়ে আন্দোলন করেছে তাতে সৃষ্টি হচ্ছে জনগণের দুর্ভোগ। আল্টিমেটলি এ আন্দোলন দেশের জনগণের বিরুদ্ধেই, দেশের জনগণ যদি উন্নতি ও অগ্রযাত্রার প্রতিবন্ধকতা মনে করে গত নির্বাচনের মত ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেয় তবে তাদের করার কিছুই থাকবেনা। এবং এর জন্য তারাই দায়ী থাকবে। বিগত সরকারের আমলে আওয়ামী লীগ ৩১ দফা দাবি পেশ করে। পরবর্তীতে কেয়ারটেকার সরকারের সময়ে তা পরিণত হয় ১১ দফায়। সময়ের ব্যবধানে তা চলে আসে ৩ দফায়। এ অবস্থা দেখে আওয়ামী লীগের আসল দাবি কোনটি সেটি যেমনি বোঝা কঠিন তেমনি বর্তমান আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হয় 'থাক ভিক্ষা তোর কুত্তা সামলা' নীতি। এর আসল কারণঃ

(ক) বিগত দিনের নির্বাচিত ও পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে আওয়ামী লীগ আজ দ্বিধাবিভক্ত। নিজের ঘর সামলাতেই দায়, কারণ এই তথাকথিত আন্দোলন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তারা নির্বাচনের ন্যূনতম প্রস্তুতিটুকুও নিতে পারবে না। এ জন্য এখন আওয়ামী লীগ নির্বাচনের সময় বাড়ানোর সুর তুলছে। কথা বলছে নির্বাচনী তফশীল নিয়েও।

(খ) সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের দেশের অধিকাংশ এমপিরা যতটুকু না জনগণের খেতমত করার জন্য নির্বাচন করেন তার চেয়ে বড় টার্গেট থাকে নিজেদের অর্থবিত্তে সমৃদ্ধ করা। এই মুহূর্তে শেখ হাসিনার একথা বুঝতে বাকি নেই যে বিএনপি'র সুবিধা -বঞ্চিতদের সংগঠিত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এলডিপি। আর আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচন বয়কট করলে তার দলের নির্বাচিত

www.amarboi.org

হওয়া ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে অন্য কোনো দল। নির্বাচনে হারুপার্টি বা পরাজিত ব্যক্তিদের অবস্থা হবে মুসলিম লীগ-এর মত। যার ইঙ্গিত আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর এক কলামে লিখেছেন এভাবেই, "আওয়ামী লীগের ভেতরে একটি প্রগতিশীল ডানপন্থী গ্রুপ আছে, যারা যে কোনো অবস্থায় নির্বাচনে যেতে চায়। তাদের এজেন্ডা নির্বাচনে জেতা নয়, যে কোনোভাবে আওয়ামী লীগকে আন্দোলনে বিরত রেখে নির্বাচনে টেনে নিয়ে যাওয়া। এরা রাজনীতিতে আওয়ামী লীগার এবং ব্যবসায়ে বিএনপি'র পার্টনার। এদের অন্তত ছয় হাজার নাম আমি জানি এবং এদের কৃতকর্মের প্রমাণপত্রও আমার কাছে আছে। বর্তমানে আন্দোলনের ক্ষতি হবে ভেবে এই মুহূর্তে এদের মুখোশ উন্মোচন করতে চাইনা। দিন অবশ্যই আসবে। যখন এদের মুখোশ আমাকে খুলতে হবে না; দেশের মানুষ তাদের আসল চেহারা ধরে ফেলবে। ততদিনে আওয়ামী লীগের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। একাত্তর সালেও আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন একটি চক্র বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিল। পরে তারাই মুজিবনগরে বসে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সাহায্য জুগিয়েছে। ১৯৭১ সালে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল তাতে বঙ্গবন্ধু এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সংগ্রামে এগিয়ে যেতে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। ২০০৬ সালে সেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নেই এবং শেখ হাসিনার মধ্যেও নেই বঙ্গবন্ধুর মত সেই দুঃসাহস। আমি তার মধ্যে তা আশাও করি না।"

আওয়ামী লীগ একের পর এক দাবি দেয়ার মধ্যদিয়ে তাদের হারানোর তুলনায় অর্জন কতটুকু তা কি তারা খতিয়ে দেখবে না? প্রথম আলো পত্রিকায় ফরহাদ মজহার লিখেছেন, আওয়ামী লীগ কিছু অর্জন করতে গিয়ে ২৮ তারিখে যে পৈশাচিকতা দেখিয়েছে তার মাধ্যমে অর্জনের তুলনায় হারিয়েছে অনেক বেশি। সুতরাং এটি শুধরে নিতে আওয়ামী লীগকে হতে হবে অনেক সংযমী, সহনশীল। কিন্তু অবরোধ ও কঠিন কর্মসূচি কি সেই সহনশীলতারই বহিঃপ্রকাশ?

এই হঠকারী আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যে অজুহাতগুলো দাঁড় করিয়েছে তার মাধ্যমে তারা সাংবিধানিক পদগুলো বিতর্কিত করেছে সবচেয়ে বেশি আর এই জন্যে খেসারত দিতে হবে তাদেরকেই। প্রশাসনের সব পর্যায়ে অবিশ্বাস ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে ফলে যারা নিজের লোক তারাও হচ্ছে ক্ষিপ্ত আর যারা অন্যদলের তাদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে প্রতিশোধস্পৃহা। ফলে আগামী নির্বাচন করতে আওয়ামী লীগ এখন উভয় সঙ্কটে। আওয়ামী লীগ আন্দোলনের জন্যে কেয়ারটেকার সরকারের সময় বেছে নিয়ে নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করেছে।

www.amarboi.org

ফলে তাদের আন্দোলন, সহিংসতা, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙ্গা-গড়ার শিকার ৪ দলীয় জোট না হয়ে হয়েছে জনগণ। যার ফলে জনগণ আগামী নির্বাচনে এর সমুচিত জবাব দিবে।

এবার দেখা যাক আওয়ামী লীগ আন্দোলনের লাভ ক্ষতির হিসাব; প্রথমে ধরা যাক কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট তথা প্রধান উপদেষ্টা। সংবিধানের ৫৮নং ধারা অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা ছিল কে.এম হাসানের। কিন্তু আওয়ামী লীগ কে.এম হাসানকে বিএনপি'র লোক ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বিব্রত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি একজন সম্মানিত নম্র ভদ্র লোক। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ আবিষ্কার করল লগি-বৈঠাতন্ত্র। গণতন্ত্রের পথে প্রধান অন্তরায় এ কর্মসূচি দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনার মুখে বন্ধ করতে আওয়ামী লীগ বাধ্য হলো। প্রকাশ্য দিবালোকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য উল্লাস বিশ্বমানবতাকে করেছে স্তম্ভিত। সুতরাং ২৮ অক্টোবরের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ গোটা জাতিকে উপহার দিয়েছে ২৮টি লাশ এবং ঘটিয়েছে নব্য বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। যা আগামী নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের বক্তব্যের খোরাক। আর আওয়ামী লীগের কেউ কেউ এই পর্যায়ে এসে হতাশা ব্যক্ত করেছে যে এত আন্দোলন করে তাদের অর্জন কী? বরং তাদের লোকসানই হয়েছে বেশি। আওয়ামী লীগ এখন মনে করছে ড. ইয়াজউদ্দীন প্রধান উপদেষ্টা হওয়াতে লাভ না ক্ষতি হয়েছে বেশি। কারণ ড. ইয়াজউদ্দীন একজন অরিজিনাল বিএনপি এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজার বিপর্যয়ের পর তারা একজন বিশ্বস্ত বিএনপিকে সে পদে বসিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের ২১ বছরের আগের কথিত বিএনপি কে.এম হাসানকে বাদ দিতে গিয়ে পেল ৫ বছর পূর্বের তাজা বিএনপি ড. ইয়াজউদ্দীনকে।

৭২-৭৪ এর বাকশাল কায়েম, হত্যা বা হানাহানি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি অভিশপ্ত ও ফ্যাসিবাদী চরিত্রের সাথে নতুন করে যোগ হল সংবিধান অমান্যকারী ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নকারী হিসাবে। সাংবিধানিক পদগুলো বির্তকিত করার যে পথ আওয়ামী লীগ সুগম করেছে আগামী দিনে কেউ যে তা অনুসরণ করবে না তাও বলা কঠিন। কারণ এক মাঘে শীত যায়না। অন্যের জন্য গর্ত খনন করলে তাতে নিজকে পড়তে হয়। যার উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ যে আইন করেছিলেন অন্যকে শায়েস্তা করতে পরবর্তীতে সেই আইনের গেড়াকলে পড়েই তিনি নির্বাসিত হন। সুতরাং আওয়ামী লীগের এমন কিছু করা ঠিক নয় যা তাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

www.amarboi.org

প্রবাদ আছে 'গরম ভাতে বিড়াল বেজার'। আজ শেখ হাসিনা বেজার র‍্যাবের উপর। যে র‍্যাবের সাফল্য সকলের মুখে মুখে তবুও তিনি কেন র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ করতে চান? কারণ হতে পারে তিনি তার লালিত সন্ত্রাসীদের হারাতে চান না। যদিও র‍্যাবের অভিযানে বিএনপির লোকই মারা গেছে সবচেয়ে বেশি; তারপরেও খালেদা জিয়া পিছপা না হয়ে আপোষহীনতার পরিচয় দিয়েছেন যা শেখ হাসিনা পারেননি। বরং তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে নব্য রক্ষীবাহিনী গঠন করেছেন। শেখ হাসিনা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন তিনি ক্ষমতায় আসলে র‍্যাবের কার্যক্রম বন্ধ করবেন? বন্ধ করাতো দূরের কথা প্রতিপক্ষ দমনের সবচেয়ে উত্তম হাতিয়ার হিসাবে তিনি র‍্যাবকে ব্যবহার করবেন। সুতরাং শেখ হাসিনা বা ১৪ দলের এই দ্বৈতনীতি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আওয়ামী লীগের এবারের ন্যক্কারজনক সংযোজন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে না উঠতে পারার সিদ্ধান্ত, বিএনপি একের পর এক প্রত্যেকটি পর্যায়ে উপদেষ্টাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ৪ দলীয় জোট তাদের উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং জনগণের উপর আস্থাশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে। তাছাড়া দেশে বিদেশেও ৪ দলীয় জোটের সংবিধান সংরক্ষণ নীতি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে আবারও প্রমাণিত হলো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আওয়ামী লীগের নিকট নিরাপদ নয়। আমি মনে করি ৪ দলীয় জোটের এই উদার রাজনীতি সংবিধান সংরক্ষণের দৃঢ়তা আগামী দিনে ক্ষমতায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এবার আসা যাক প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রসঙ্গে। প্রথমে একটা কথা বলি, আমাদের এবং উন্নত বিশ্বের এখনো যে পার্থক্য তা হলো "ব্যক্তির বিরোধীতা নয় নীতির বিরোধীতা"। আমরা করি ব্যক্তির বিরোধীতা, নীতির বা ভুলের নয়। এ জন্যেই আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। ৪ দলের জোট ক্ষমতায় থাকতেই ভোটার লিস্টের কাজটি সম্পূর্ণ করলে ভালো হতো। এক্ষেত্রে জেদের মানসিকতা পরিহার করা প্রয়োজন ছিল। তাহলে এখন আন্দোলনের মুখে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হতো না। আর মধ্যস্থতার মোড়লীপনার সুযোগও পেতনা আমেরিকা। যদিও এনডিএফ রিপোর্টে একথা স্বীকার করেছে যে, এই দ্বৈত ভোটারের মাধ্যমে এককভাবে কোনো রাজনৈতিক দল লাভবান হতে পারতোনা।

বর্তমান এই কঠিন সময়ে আরো বেশি নিরপেক্ষতার প্রয়োজনে মুদাব্বির হোসেনকে নির্বাচন কমিশন না করাই ছিল শ্রেয়, কিন্তু আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগের অর্জন কি? এম.এ আজিজ সিইসি থাকলে তিনি আওয়ামী লীগের চাপ, হাইকোর্টের রায় ইত্যাদির কারণে নিরেপক্ষতার প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাকে পদত্যাগ করাতে পারেনি বরং তিনি বহাল তবিয়তে পর্দার আড়াল

www.amarboi.org

হলেন মাত্র। আমি তো মনে করি বিচারপতি মাহফুজুর রহমান হলো ডাবল আজিজ এই অর্থে যে, আজিজের বুদ্ধি তার সাথে যোগ হলো।

কিন্তু একথা ঠিক যে, নির্বাচনকে প্রভাবিত করার মত কমিশনারদের কোনো সুযোগ নেই, এর প্রমাণ ইসি আবু সাঈদ। আওয়ামী লীগের নিয়োগ দেওয়া আবু সাঈদ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে পারেনি। তিনি এখন আর ক্ষমতায় নেই। তাই এই মুহূর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রীকতা পরিহার না করার কারণে এই বেড়াজাল থেকে তারা বের হতে পারবে না। আওয়ামী লীগের থিংক ট্যাংক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন যে, বিএনপি-জামায়াত চক্রের শেষ আশা আওয়ামী লীগ বা ১৪ দল নির্বাচনে না গেলে তাদের কোনো অসুবিধা হবে না বরং সুবিধাই হবে। কারণ ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একমাত্র বিএনপি ছাড়া আর সকল দল নির্বাচন বর্জন করেছিল, এমনকি জামায়াতও। এবার সেই পরিস্থিতি নেই। এবার তাদের সাথে রয়েছে সারা দেশে সাংগঠনিকভাবে মজবুত জামায়াত এবং এরশাদ তো আছেই। এরশাদের বর্তমান পরিস্থিতি যাই হোক সে বিএনপির সাথেই আসবে। কারণ যাকে দিয়ে বউ তালাক দেয়া যায় তাকে দিয়ে সবই সম্ভব।

কিন্তু বিচারপতি এম.এ আজিজের বিরুদ্ধে ১৪ দলের আন্দোলন যত না জোরদার ছিল তার চেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল কতিপয় পত্রিকা। এর কারণ হচ্ছে একটি মামলায় এম.এ আজিজ পত্রিকার সম্পাদকদের কারাবন্দির আদেশ দিয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। পরে বিনীত ক্ষমা চাইলে কোর্ট ক্ষমা করে আর এই সুযোগে সেই পত্রিকা বা মিডিয়াম্যানরা উঠে পড়ে লাগে। যাক তারপরেও আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তেও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের মাতম তুলছে। সত্যিই তাদের কাছে পুনর্গঠনের রূপরেখা আছে কি?

এবার আসা যাক আদালত প্রসঙ্গে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তথা জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনই আইনের লক্ষ্য। এটা অর্জন করা তখনই সম্ভব হবে যখন ন্যায়বিচার আইনানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে প্রয়োগ করা যায়। আদালত অবমাননা একটি বিশেষ ধরনের অপরাধ যা ফৌজদারী অপরাধের কাছাকাছি বলা যায়। এছাড়া আদালত অবমাননার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় কোনো বিশেষ কাজ বা আচরণকে আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে কিনা তা নির্ণয় করার দায়িত্ব রয়েছে আদালতের উপর। যুক্তরাজ্যে আদালত অবমাননা সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন অসঅল্ড ১৮৯০ সালে। তার মতে, আদালত অবমাননা বলতে এমন কোনো আচরণকে বুঝায় যা আইনের কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থার অসম্মান প্রদর্শন করে। সে হিসাবে ভাঙচুর তো দূরের কথা প্রকাশ্যে মিডিয়ায় চিৎকার দিয়ে বলেছেন যে, আজ থেকে প্রধান

www.amarboi.org

বিচারপতিকে মাননীয় বলা হবেনা। তাহলে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এই দম্ভোক্তি কোন্ পর্যায়ে পড়ে? এই দম্ভোক্তি ও প্রধান বিচারপতির কক্ষ ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিচারপতিগণ আদালত বর্জন করে ন্যূনতম প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। আজ সর্বোচ্চ আদালত আওয়ামী নখরে ক্ষত বিক্ষত। প্রধান বিচারপতির কক্ষ যখন আওয়ামী তাণ্ডব ও ধৃষ্টতার শিকার তখন বিচারপতিদের আদালত বর্জন নিন্দনীয় আঘাতের সামান্য প্রতিবাদ মাত্র। ইতোমধ্যে তথাকথিত সবজান্তা সংবিধানের অপব্যাখ্যাদাতাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দেয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন আদালত অবমাননাকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। যে আওয়ামী লীগ বিচারকার্যে হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনছেন তারাই ইতিপূর্বে ক্ষমতায় থাকতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করার দৃষ্টান্ত দেশবাসীর এখনও মনে আছে। আদালতের প্রতি আওয়ামী বিদ্বেষ সবসময়। সংবিধান বিশেষজ্ঞ কামাল সাহেবরা এখন কি বলবেন? কে বা কারা হামলা করেছে বলে নিজেদের অপকর্ম গোপন করা যাবে না। অ্যাটর্নি জেনারেল কিছুটা বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে ১৪ দলকে লালকার্ড দেখানো ঠিক হয়নি। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা ইতিপূর্বেও ঘটেছে। কাজী ফারুকের মামলায়ও রায়ের পূর্বক্ষণে প্রধান বিচারপতি আদেশ স্থগিত করেছেন। তবে আওয়ামী লীগ এই ঘটনাকে ইস্যু বানিয়ে তুমুল আন্দোলন করতে পারতো। তা না করে দলীয় আইনজীবী ও রাজপথের ক্যাডারদেরকে খবর দিয়ে জ্বালাও- পোড়াও করে যে লেজে-গোবরে অবস্থা করেছে তা থেকে বের হওয়া বড়ই কঠিন হবে। ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয় বরং তাদেরকে কঠিন মাশুল দিতে হবে। অবস্থা দেখে মনে হয় প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৩ দল কারেন্টজালের মত আষ্টেপৃষ্টে আটকে গেছে। এখন তারা যত পেছাবে তত আটকাবে। এর থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে কি?

www.amarboi.org

ওয়ান ইলেভেন : সংস্কারের রাজনীতি নয় রাজনীতির সংস্কার

রাজনীতিবিদগণ ইতিহাস তৈরী করেন। লিখেন ইতিহাসবিদগণ। আর কালের পরশপরায় সেই ঘটনাই চিহ্নিত হয়ে থাকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার ৩৮ বছরে ওয়ান ইলিভেন তেমনি এক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু ইতিহাস বিদগণ ইতিহাসের নির্মাতাদের সবটুকু ঘটনাই কাগজের পাতায় তুলে আনতে পারেন না। কিন্ত রাজনীতিবিদ নিজেই যদি ইতিহাস লেখেন, তাহলে তাকেই বলা যায় পরিপূর্ণ ইতিহাস। ওয়ান ইলিভেনের রাজনীতির সংস্কারের নামে দেশকে রাজনীতি শূন্য করার যে হীন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তার ভিতরের অসংখ্য লুকিয়ে রাখা ইতিহাস এই জাতী তখনই জানতে পারবে যখন শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া, মতিউর রহমান নিজামীসহ রাজনৈতিক দলের শীর্ষ ব্যক্তিরা নিজেই ইতিহাস লিখবেন, সেই দিন পর্যন্ত ওয়ান ইলিভেনের দানবীয় চরিত্র জানতে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনিব্লেয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। লন্ডনসহ কিছু কিছু শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারও করা হয়েছে। একদিনের মাথায় নতুন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নাম ঘোষণা করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইরাক যুদ্ধে ব্লেয়ারের কড়া সমালোচকদের একজনকে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তাদের দেশের উন্নতি থেমে থাকেনি। অবকাঠামোগত খুব পরিবর্তনও হবে না। এগিয়ে যাবে ব্রিটেন তার সুনির্দিষ্ট গতি পথে। খুব বেশি সংস্কার আনা হবে না। নেম প্লেট উপড়ে ফেলা কিংবা অসহযোগ আন্দোলন, জ্বালাও পোড়াও কোন কিছুর-ই ধারণা নেই সেখানে। তাদের মধ্যে কেবল এ ভালোবাসাটুকুই প্রবল যে এ দেশ আমাদের। সকল ভেদাবেদের পরিসমাপ্তি এখানেই। ব্রিটেনেও যে কোন সমস্যা নেই তা বলছি না। বরং দেশপ্রেমের নজিরটিই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা? ২৮ অক্টোবর বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে আমাদের গণতন্ত্র! লাশের ওপর নৃত্য উল্লাসের দৃশ্য। লগি বৈঠার হামলায় আহত ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের আর্তনাদ। এ কোন গণতন্ত্র? আমরা যেন গণতন্ত্রের বন্দিখাঁচায়। এ যেন মৃত্যুপুরির উপত্যকা। তাহলে আমরা কি এমন গণতন্ত্র চেয়েছি? নাকি আমাদের আসল গণতন্ত্রের গতিরোধ করা হয়েছে বারবার। এটি কি আমাদের নিয়তি, আমাদের অযোগ্য ও অদূরদর্শী নেতৃত্বেরই ফল। না আমরা! যাদের থেকে গণতন্ত্র ধার করেছি। তাদের ইচ্ছামাফিকই আমাদের পথ চলা নির্ধারিত। ৩৬ বছরে পথ চলায় আমাদের এত বিপর্যয় যেন সে কথাই প্রমাণ করে। তা ছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির দেশে গণতন্ত্রের বিকাশে পশ্চিমা শক্তি আতঙ্কিত। এ জন্য আমেরিকার জনৈক

www.amarboi.org

প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন আমরা কোন মুসলিম দেশে গণতন্ত্রের উত্থানকে অগ্রসর হতে দেবো না। আমরা যে গণতন্ত্র পেয়েছি, তা বার বার বোল পরিবর্তন করে নিজের অপরাধ ঢেকে অন্যের ওপর আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করে। আমাদের গণতন্ত্রের প্রধান বাধা গণতন্ত্রের তথাকথিত প্রবক্তারাই। আর তাদের দোসর, দালালরা যাদের মুখ দিয়ে বলানো যায় তাদের শেখানো কথা। তারাই বাংলাদেশীয় মীরজাফর।

এই জন্যই সম্ভবত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে শেষ কথা লিখেছিলেন "পাকিস্তানের জন্য গণতন্ত্র নয়।" আমরা আজ এরই বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি কি। ১৯৪৭ সালে ভাগ হওয়া ভারত এবং পাকিস্তানের তাদের উন্নতি অগ্রগতির বিরাট পার্থক্য। ভারত যখন আজ এতদঅঞ্চলের সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন পাকিস্তানের সার্বিক অবস্থা হ-য-ব-র-ল। দেশটিতে প্রতিদিনই চলছে সহিংসতা। আর ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশ ও মনে হয় পাকিস্তানকে অনুসরণ করে চলছে। এ জন্য আমাদের গণতন্ত্রের আজ কোন স্থিতিশীলতা নেই। আমরা যেন পাকিস্তানের গণতন্ত্র নির্বাসনের পদ্ধতি অনুকরণ না করি। তাহলে বাংলাদেশ রাজনীতিশূন্য একটা ডিজুজ জাতিতে পরিণত হবে। আর বহিঃশক্তির মাতাব্বরি আমাদের ওপর আরও সহজ হবে। এখন শুধু বাধা রাজনৈতিক সরকার অন্য কিছু নয়। এ জন্য আমাদের ঘৃণা থাকবে অসৎ, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের প্রতি, রাজনীতির প্রতি নয়। আমাদের দেশের উন্নতি এবং অগ্রগতির পেছনে রাজনৈতিক শক্তিই মূখ্য ভুমিকা পালন করে এসেছে। এদেশের রাজনীতিবিদদের ত্যাগ তিতিক্ষা, জীবন সংগ্রাম, দেশ, মাটি ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। তাই রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে ঢালাও মন্তব্য পূর্বসূরিদের প্রতি অবজ্ঞার শামিল। আমাদের বহিঃবিশ্বের তথাকথিত বন্ধুবেশী শত্রুরা আমাদের যেদিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের থাকতে হবে সজাগ এবং সতর্ক। আমার দেশের চোর-ডাকাত যা হোক তাদের শাসন এবং সংশোধনের দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে। কিন্তু এর নামে অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলে সে জাতির সর্বনাশ করে বের হবে।

১১ জানুয়ারি আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অযোগ্য ও অদূরদর্শী নেতৃত্ব গোটা জাতিকে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ জন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল এর মতে, কোন ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় হয়তো একজন মানুষ মারা যাবে। একজন প্রকৌশলীর ভুল ফর্মুলায় একটি দালান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু একজন রাজনীতিবিদের ভুল সিদ্ধান্তে গোটা জাতি বিপর্যস্ত হবে। জাতির এমন এক ক্রান্তি লগ্নে পাশে এসে দাঁড়ালো আমাদের গৌরব ও অহঙ্কারের মুকুট সেনাবাহিনী। এর মধ্যে দিয়ে সেনাবাহিনী অবারও প্রমাণ করলো তারা জনগণের শ্রেষ্ঠবন্ধু।

www.amarboi.org

শুরু হলো আমাদের সমাজের সকল রন্ধ্রে রন্ধ্রে গর্জে ওঠা দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অস্বচ্ছতার, বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম। অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের মানুষ। এ অভিযান রাজনীতির বিরুদ্ধে নয়, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। এ কথা ঠিক যে, এ সরকার কোন রাজনৈতিক সরকার নয়। বিধায় তাদের কিছু কিছু ভুল মানুষ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। কিন্তু জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সরকারকে অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা মোকাবেলা করছি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে। যেখানে রাজনৈতিক সরকার অধিষ্ঠিত।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার উদ্যোগকে আমারা স্বাগত জানাই। সংস্কারের প্রক্রিয়ার সাথে সম্ভবত একমত হতে পারেনি দেশের জন সাধারণের বিরাট একটি অংশ। কারণ এই উদ্যোগ যখন চলছে তখন যেন মনে হচ্ছে সরকার যাদের কথা বলতে দেবে তারাই কথা বলবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক নয়। সরকারকে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সকল আন্দোলন সংগ্রাম, ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ তার অন্যতম। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের জনগণ এখনো কয়েকটি রাজনৈতিক দলের অধীনে সংগঠিত। সুতরাং তাদের সংস্কারের প্রক্রিয়াটা যথাযথ না হলে বিস্ফোরণ ঘটবে। রণক্ষেত্রের অসম প্রক্রিয়াও কি না তাও ভেবে দেখতে হবে সরকারকে। সরকারের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সংস্কার প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ আমাদের কোন অশুভ শক্তির গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয় কি না? তাও চিন্তার। এ কথাও মনে রাখতে হবে অধিক সংস্কারের নামে আমাদের জাতীয় ঐক্য যেন বিনষ্ট না হয়।

সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর গন্তব্য এখন পুরোপুরিই অনিশ্চিত। বড় দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতারাই এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রীতিমতো সন্দিহান। এ কারণে অনুসারী নেতা-কর্মীদেরও তারা স্থিতিশীল ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাস দিতে পারছেন না। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোতে ভাঙ্গাগড়ার খেলা থেমে নেই। দলীয় রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করার তাগিদের চেয়েও এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভালমন্দের হিসাবটিই মুখ্য। আর সে কারণেই চলমান এই সংস্কার প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে খোদ সংস্কারবাদীদের মধ্যেই।

'ওয়ান-ইলেভেন' পটপরিবর্তনের পর, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সাথে যুক্ত রাজনীতিবিদরা এবার আর রং পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়তো পার পাবেন না প্রথম দিকে এমনই মনে হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। গত ৫ বছরে দুর্নীতির মাধ্যমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছেন এমন অনেকের মুখেই এখন সংস্কারের শ্লোগান। টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ

www.amarboi.org

কেউ কথিত সংস্কারের পক্ষে জোরালো বক্তব্যও দিচ্ছেন। দলীয় রাজনীতির সংস্কার নিঃসন্দেহে অত্যাবশ্যক। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেই সংস্কার হওয়া উচিত। তাই বলে সংস্কারের লেবাস পরে দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে যাবে- এটা হওয়া উচিত নয়।

তা'ছাড়া বিএনপি ও আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এখন যারা সংস্কারপন্থী হিসাবে সামনে আসার চেষ্টা করছেন, এমন ভূমিকার পেছনে এদের অধিকাংশেরই রয়েছে হরেক রকম ব্যক্তিগত এজেন্ডা। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সাথে জড়িতরা আসছেন সম্ভাব্য যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য। কারো উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলীয় রাজনীতির প্রথম সারিতে জায়গা করে নেয়া। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু কিছু নেতা আছেন, যারা সত্যিকারার্থেই সংস্কারের মাধ্যমে দলের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। তবে যার উদ্দেশ্য যাই হোক, নিজেদের গন্তব্য সম্পর্কে এরা কেউই নিশ্চিত নন। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে ব্যক্তিত্বের খুবই অভাব লক্ষণীয়। পদ গ্রহণে যেমনি যুদ্ধ, তেমনি আসন থেকে নামাতেও এখানে কম শক্তির প্রয়োজন হয়না। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এদিক থেকে অনেক এগিয়ে। আমাদের নেতা-নেত্রীরা যদি সুনিয়া গান্ধীর মত উদার মানসিকতা লালন করতেন তাহলে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের জন্য অনেক সহজ হত।

যদিও এখন স্বয়ং বড় দুই দলের নেতৃত্বেই তাদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা, অদূরদর্শিতার কথা অকপটে জাতির সামনে প্রকাশ করছেন। আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দলীয় ও আত্ম সমালোচনার ফিরিস্তি, জাতির সামনে যেভাবে তুলে ধরে ক্ষমা চেয়েছেন। তাতে গোটা জাতি স্তম্ভিত। বিএপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ও দলীয় সমালোচনা ও সংস্কার এ কায়দায় এগিয়ে চলছেন। কিন্তু ভাগ্য বরণ যেন অনিশ্চিত। কারণ অতীতের উদাহরণ আমাদের সামনে দণ্ডায়মান। স্বয়ং ড. কামাল, বদরুদ্দোজা চৌধুরী আর ড. ইউনূস সাহেবদের নিয়তি, পরিণতি ও দুর্গতি।" মাইনাস টু থিওরির উদ্যোক্তাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত, বাংলাদেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে এখনো খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে বিএনপি, আওয়ামী লীগ কল্পনা করা যায় না। যদি সত্যিই দুই নেত্রী তাদের দল, ও নিজেদের আস্তিত্ব রক্ষায় স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মত অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাহলে এ জোয়ার আর বাঁধ মানবে না। পরিস্থিতি সেদিকেই গড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

জাতীয় পার্টির শাসনামলের উপপ্রধানমন্ত্রী শাহ মোয়াযযেম সাহেব মাত্র কয়েক মাস আগে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ফলাও করে যোগদিলেন। যিনি ছাত্রজীবনে

www.amarboi.org

ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি। টার্গেট ছিল নির্বাচন করা। ১১ জানুয়ারি বিপর্যয়ের পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, "১১ জানুয়ারি আর ১৭ দিন পূর্বে আসলো না কেন? অর্থাৎ এ বিপর্যয়টা যদি আর ১৭ দিন আগে আসত তাহলে তিনি আর বিএনপিতে যোগ দিতেন না। এযেন আবাহনী মোহমেডান এর মত পলেটিকেল স্পটিং ক্লাব। যখন যেখানে সুযোগ সেদলে ব্যাঙের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে।এ হলো আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্র।

আজকেও যারা সংস্কার সংশোধন পরিশীলন, পরিমার্জন, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্রায়ন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবারতন্ত্রের উচ্ছেদ। আত্ম উপলব্ধি ও আত্মসমালোচনায় হঠাৎ মেতে উঠলেন, ১১ জানুয়ারির পূর্বে তাদের এই অনুভূতি কেন জাগ্রত, হয়নি, বিকেক সত্ত্বার এই অসচেতনা গোটা জাতিকে করেছে ক্ষত বিক্ষত।

সংস্কারের ট্যাবলেট জোর করে খাওয়ালে তা হিতে বিপরীত হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সরকারের সাফাই গেয়ে বক্তব্য বিবৃতি দিচ্ছেন, তারাই যে পট পরিবর্তনে ঘুরে দাড়াবে না তার বিশ্বাস কোথায়। কারণ সুযোগ সন্ধানীর আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। যারা- এখন যারা সংস্কার সংশোধন পরিশীলন, পরিমার্জন, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্রায়ন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবারতন্ত্রের উচ্ছেদ এর কথা বলেন। এই মাত্র কিছুদিন আগেই তো তাদের নেতৃত্বে রাজপথসহ সার দেশে চলেছে, হত্যা সন্ত্রাস, জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর এর বিভীষিকা। কই আমরা তো বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা কাউকে সেখানে দেখিনি। যারা খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনার সামনে মোরাকাবা করে জ্বি হুজুরের ভূমিকা ছিলেন তারা এখন সংস্কারের কথা বলছে। লুটপাটের রাজনীতিতে সবার অংশীদারিত্ব থাকলেও দোষের দায়বার এখন দুই নেত্রীর ঘাড়ে ঝুলছে। যারা বর্তমানে রাজনৈতিক সংস্কারের নামে গ্রেফতার এড়ানোর খেলায় মত্ত বিগত দিনেও তারা লুটপাটের অংশিদার-এহেন মুহূর্তে তাদের এই চটকদার ও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ আচরণই সবচেয়ে বড় দুর্নীতি। শুধু কেউ অর্থ কেলেঙ্কারিকেই দুর্নীতি বলা চলে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এটি তার থেকেও আরো মারাত্মক।

আমাদের জানা মতে আজকের যারা সংস্কারের কথা গণতন্ত্রায়নের আর জবাবদিহি, পরিশীলন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে যারা সোচ্ছার। তাদেরকে একদিনও শোনা যায়নি, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটি মিটিং এ জোরালো কথা বলতে। তখন তাদের এই গণতন্ত্রায়নের এই জিহাদী মানষিকতা কোথায় ছিলো? অথচ জালেম শাসকের সামনে উত্তম কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

www.amarboi.org

বরং সেই সময় যারা মিডিয়ার সামনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সবচেয়ে বেশি গণতান্ত্রিক দল বলত তারাই আজ সবচেয়ে বেশি নেত্রীর বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগ আনছে। যারা সেই সময় তারেক বন্দনা জয় বন্দনা গেয়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার প্রিয় হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারাই এখন পরিবারতান্ত্রিকতার অভিযোগ উঠাচ্ছে। তারা কি বলবেন? ১১ জানুয়ারির এই বিপর্যয় যদি নাহতো তাহলে এই মানুষগুলোই আজ কি এ কথাগুলো বলতেন? । বরং তাদের নেতৃত্বেই চলত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলবাজি, গলাবাজির, আর রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের আগ্রাসী হামলা। যার স্বীকার হত এ দেশের নিরীহ জনগণ।

মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে তারা যখন খুব সংস্কার, গণতন্ত্রায়ণ, বিকেন্দ্রীয়করণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সংশোধন, পরিশীলন, পরিমার্জন ও পরিবারতান্ত্রিকতার কথা বলে, তখন আমাদের হাসির উদ্রেগ হয়। তাদের কে আমাদের খুব বেশি সন্দেহ হয়। আমরা খুব বেশি আশান্বিত হতে পারি না। সন্দেহের ধূম্রজাল আরো ঘিরে ফেলে। জনগণের এ সন্দেহ অমূলক নয়। বরং যৌক্তিক, বৌদ্ধিক। সচেতন নাগরিকতার পরিচায়কও বটে।

যারা আমাদের খুব এগিয়ে নেয়ার গান শোনান, তাদেরকে আমরা দেখেছি। রাজপথে, সংসদের জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। আমরা তাদের দেখেছি দুর্নীতি চরিত্রহীনতায় লিপ্ত থাকতে। এ যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মাত্র। নতুন বতলে পুরাতন মদ।

দুর্নীতি অভিযান যেন রাজনীতির বিরুদ্ধে না হয়। আবার রাজনৈতিক বিরোধিতা যেন শুধু খালেদা, হাসিনা আনুগত্য পরায়ণদের বিরুদ্ধে না হয়। এর ভারসাম্য চায় মানুষ। কারাগারে অনেক নেতা মানবেতর জীবন যাপন করছে। আর এর থেকে বড় অপরাধীরা যদিও সংস্কারের মাতম করতে থাকেন। তাহলে দুর্নীতি দমন অভিযানকে করবে প্রশ্নবিদ্ধ।

আমাদের সেই দিকেও নজর দিতে হবে। আমরা এখন বস্তি উচ্ছেদ, দালান ভাঙ্গার যাবতীয় কাজ সেনাবাহিনীর মত দক্ষ লোক দিয়ে বাস্তবায়ন করিয়ে নিচ্ছি। এই দেশকে পরিচালনায় তারা আজীবন থাকবে না। সৈনিক দিয়ে অপরাধসমূহ দামিয়ে রেখে আহলাদিত হওয়ার কিছু নেই বরং কিছুদিন পরেই ১৩ শ মানুষের জন্য একজন পুলিশ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা তো এদেশের সব মানুষকে এক সাথে বাদ দিয়ে চলতে পারব না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সাথে সাথে নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন জাতি গঠনের কর্মসূচীও হাতে নেয়া প্রয়োজন। জোর করে স্তব্ধ করা যায় উপড়ে ফেলা যায় না। শক্তি দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু সংশোধন করা যায় না। অবশ্য ইতোমধ্যে দুদক এর দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে মসজিদের

www.amarboi.org

ইমামদের সম্পৃক্ত করে চিঠি দেয়ায় এই সুন্দর উদ্যোগকে দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছে।

আমাদের দেশ পরিচালনামূলত একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত। এখানে শিক্ষা দীক্ষা সাথে সাথে তার রাজনৈতিক সরকার পরিচালনায় দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। যদিও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে তার ব্যতিক্রম। দেশ পরিচালনায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হলেও এর মধ্যে দেশের অনেক স্বনাম ধন্য স্বীকৃত শিক্ষাবিদগণ সরকার পরিচালনার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। আমাদের দেশের জন্য এটা দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনকও বটে। তাই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে। সাথে সাথে একটি উন্নত জাতি গঠনে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যা এ সকল কিছুর মূলোৎপাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গড়ে উঠবে একটি নতুন প্রজন্ম। নচেৎ কিছুদিন পরপর অভিযান চালিয়ে কারাগার ভর্তি ও সরকারি কোষাগারে কিছু দুর্নীতির টাকা জমা হবে। কোন স্থায়ী কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে না।

অতিমাত্রায় রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট, বিচারপতি, নির্বাচন কমিশন, সিভিল সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সবই নিয়োগ পেয়ে আসছে। এটিকে একদিনে পরিশীলন পরিমার্জন ও সংশোধন করা অসম্ভব। তাই এই সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে শুধু দমিয়ে তাদের কাজ শেষ করবে না। বরং রাজনীতির কবল থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে বের করার নিশ্চিত পথ তৈরি করতে পারলে সেটি হবে জাতির জন্য মঙ্গলজনক।

আমাদের দেশের এ চলমান অবস্থায় আমাদের প্রতিবেশী ভারত যেন অনেক দুলিয়ে মুচড়িয়ে অট্টহাসিতে লিপ্ত। কিন্তু তারা চেষ্টা করছে তাদের হাসি যেন আমরা না দেখি। অনেক চেষ্টা করেও তা গোপন রাখতে পারছে না।

গত কয়দিন আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিব শংকর দাস বাংলাদেশে এলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, 'আমরা বাংলাদেশের এ চলমান প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে চাই না। বাংলাদেশ তার নিজস্ব গতিতে চলবে, তবে এ প্রক্রিয়াকে আমরা স্বাগত জানাই। প্রমাণ করলেন তার বিপরীত "ঠাকুর ঘরে কে-রে আমি কলা খাই না।" পরের দিন পত্রিকায় দেখলাম তিনি সম্ভবত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎও করেছেন। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাত করে পররাষ্ট্র দফতরের নিকট জবাবদিহিও করেছেন। এটা অবশ্যই অনভিপ্রেত।

ভারত আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে অঘোষিত শত্রুভাবাপন্ন অবস্থা বিরাজ করছে। সীমান্ত, পানি চুক্তি, নদীবিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে।

www.amarboi.org

এই মুহূর্তে ভারত বাংলাদেশের এই দুর্বল মুহূর্তটাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে এগুচ্ছে। বিভিন্ন চুক্তি বাস্তবায়নে তারা মরিয়া। পাশাপাশি আমাদের সেনাবাহিনী তৈরি করা হয়েছে ভারতকে সামনে রেখে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর সাথে একটি সখ্য গড়ে তোলাকেও তারা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে।

এ কথা মাথায় না রাখলে চলবে না ৩৬ বছরে আবর্জনা পরিষ্কারের দায়িত্ব যেন অল্প কিছু লোক অল্প কয়েকদিনের জন্যে কাঁধে তুলে না নেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষ সংশোধন করার নির্ধারিত পদ্ধতি দিয়েছেন। যেমন মদ হারাম করা হয়েছে তিনটি ধাপে। এ জন্যই বিরাট জনগোষ্ঠী সংশোধনের পথ অবলম্বন করেছে।

একদিনে মদ হারাম করলে কেউ হয়তো এ প্রক্রিয়া মেনে নিতেন না। কারণ সেই সময় মদ সবার নিকট প্রিয় ছিলো। প্রথমে বলা হয়েছে তোমরা মদ খেয়ে নামাজের কাছে যেয়ো না। এরপর এ কুফল তুলে ধরে ধরা হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত ভাবে হারাম করা হয়েছে।

আমরাও আমাদের দেশের সমস্যাগুলো সমাধানে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন না করলে সংশোধনের নীতি একেবারেই অসম্ভব হবে। নীতি ও প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে ভালো উদ্যোগও অনেক সময় বুমেরাং হয়।

মানব সংশোধনের প্রক্রিয়া যদি এতই সহজ হতো, তাহলে আল্লাহতায়ালা রাসূল (সা) কে মানুষের কাছে গিয়ে বুঝানোর দায়িত্ব দিতেন না। প্রয়োজন ছিল না ত্যাগ স্বীকার করার। পরিশুদ্ধ করার এই প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে যদি শক্তি দিয়ে সংশোধন করতে চাইতেন তাহলে ফেরেশতা দিয়ে শক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে তাদেরকে আত্ম উপলব্ধির কাতারে শামিল করেছেন। বিধায় পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বর, অসভ্য মানুষগুলো শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছে। তাই দেশের পনের কোটি মানুষ আশা করছে এ সরকার সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় একটি অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করবে। ফিরে আসবে আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তাহলে ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে এ সরকারের নাম। সে প্রত্যাশাই সকলের।

কিন্তু না! দিন যতই এগোচ্ছে ২৮ অক্টোবরের কলঙ্কের বোঝা ততই ভারী হচ্ছে। কারণ সুড়ঙ্গপথ ধরে যে দানব আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে তার আক্রমণে দেশটা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বিগত জরুরি সরকারের সময়। সংস্কারের নামে দেশকে রাজনীতিশূন্য করার ষড়যন্ত্র, গ্রেফতার, হামলা, মামলা দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে চাঁদাবাজি, হিংসাত্মক প্রতিশোধ, হেয়প্রতিপন্ন করার মহোৎসব, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নামে দোকান-পাট ভাঙচুর, অসহায় মানুষের কান্নার রোল, অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, দেশের সচল অর্থনীতির গতিকে পিছিয়ে দিয়েছে ২০ বছর। তার পরও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এসব থেকে মুক্তি

www.amarboi.org

পাওয়ার জন্য ২৯ ডিসেম্বর '০৯ অংশগ্রহণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। প্রত্যাশা ছিল গণতন্ত্রের উত্তরণ। কিন্তু হায়! দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে ৮৭% ভোটের আজগুবি ফলাফল নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হলো মহাজোট সরকার। ধারণা করা হচ্ছিল বিগত ২ বছরের ঘটনা থেকে রাজনীতিবিদগণ শিক্ষা নিয়ে দেশ চালাবেন। কিন্তু দেখা গেল আওয়ামী লীগ বিগত কয়েক মাসে বিডিআর হত্যাকাণ্ড, টিপাইমুখ বাঁধ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার, দক্ষিণ এশিয়া টাস্কফোর্স, এশিয়ান হাইওয়ে, সংবিধান সংশোধনী, শিক্ষানীতিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেনতেন নীতি অবলম্বন করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বিরোধী সংগঠনের ওপর হামলা-মামলা এখন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসূচি। এ ছাড়াও ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্য দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি শহীদ শরীফুজ্জামান নোমানী ও জামালপুরের হাফেজ রমজান আলীকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে দেশের প্রায় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে। ছাত্রশিবিরের কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে আহত করা হয়েছে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকানো হয়েছে অনেককে।

২৮ অক্টোররের লগি-বৈঠাধারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা থাকলেও তা রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ দেয়ার উদ্যোগ সরকারের নব্য বাকশালী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। আমি বিশ্বাস করি, শহীদের রক্ত কথা বলে, এর আছে নিজস্ব এক শক্তি। ২৮ অক্টোবর ও ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারির সেনা সদস্যদের রক্তের বেড়াজাল থেকে আওয়ামী লীগ কখনও রেহাই পাবে না। জলিল সাহেবের বোমায় বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগ বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। অনেকে বলে থাকেন ২৮ অক্টোবরের জের ধরেই ১/১১-এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি ১/১১-এর ঘটনা ঘটানোর জন্য একটি উপলক্ষ হিসেবে ২৮ অক্টোবরের নির্মম নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টারত মহলটি অবশেষে ১/১১ নিয়ে এলো। বাংলাদেশ প্রবেশ করল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। এর গন্তব্যের শেষ আসলে কোথায়? ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দিতে পারব কি আমরা? এই প্রশ্ন এখন সকলের।

জুলাই-২০০৭

www.amarboi.org



প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬

PPBN : 042
9843114260